স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

সঙ্ঘমিত্রা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং - A00HI0201516

রেজিস্ট্রেশন তাং – ২৯.০৭.২০১৬

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেরুনা মুর্মু

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

Certified that the Thesis entitled

"স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা" (Sbādhīnatā Parabartī Yugē Kalakātāra Dakṣiṇa Śaharatalitē Udbāstu Basatisthāpana: Ēkaṭi Samīkṣābhittika Ālōcanā) submitted by me for the award of the Degree of **Doctor of Philosophy in Arts** at **Jadavpur University** is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Maroona Murmu, Professor & Head, Department of History, Jadavpur University,** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere /elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Dr. Maroona Murmu
Professor & Head
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700032
Dated:

Candidate

Sanghamitra Das
Dated:

মুখবন্ধ

অতি শৈশবকাল থেকেই 'উদ্বাস্তু', 'কলোনি' এই শব্দগুলির প্রতি নিবিড় আকর্ষণবোধ করতাম। ব্যক্তিগতভাবে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান এবং একটি কলোনি বাড়িতেই আমার বড় হয়ে ওঠা। পিতামহের নিকট তাঁর পূর্ববাংলার গল্প, দেশত্যাগের কথা শুনে এপ্রসঙ্গে আমার অমোঘ ও নিবিড় উৎসাহবোধ তৈরি হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা কেন পূর্ববাংলা ত্যাগ করেছিল, কিরকম ভয়ার্থ পরিস্থিতিতে তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল- এসকল নানান প্রশ্ন বারবার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে আমি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. তে গবেষণার সুযোগ পেলাম, তখনই মনে হয়েছিল যে প্রশ্নগুলির এতদিন আমি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি- সে বিষয়টাকেই আমি আমার গবেষণার বিষয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি। অভিবাসন ও উদ্বাস্তু বিষয়ে বহু আলোচনা করা হলেও, উদ্বাস্তু কলোনি বিষয়ে যথাযথ আলোচনা হয়নি। এই অভাববোধ থেকেই আমি কলকাতা শহরতলির কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনি প্রসঙ্গে গবেষণার কথা ভেবেছি।

আমার এই গবেষণাপত্রটি রচনার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষাকে বিশেষ করে গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে কলোনিবাসী উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে আমি শুনেছি তাদের জীবনে সংগ্রামের কথা, সমস্যার কথা, আশা ও হতাশার কথা। এদের নির্ভিকতা, অপরাজেয় মনোভাব, গতিশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমার গবেষণাপত্রটির রূপায়ণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সহায়তাদানের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তাঁর সুনিশ্চিত মতামত ব্যতীত গবেষণাপত্রটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপরে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মাতা বনানী দাসকে। তিনি এই দীর্ঘ যাত্রাপথে সর্বক্ষণ আমার পাশে ছিলেন। তাঁর দৃঢ় মনোবল, সহানুভূতি আমায় সবসময় উৎসাহ প্রদান করেছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য আমার ভাই অর্ণব দাস, দিদা রমা দাস, আমার স্বামী অনির্বাণ নাথ এবং শাশুড়ি সমাপ্তি নাথ- এরা এই দীর্ঘ সময়ে আমার পাশে থেকেছেন। এছাড়াও

ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে বহু ব্যক্তি আমায় সাহায্য করেছে, টুম্পা রায়, শুভঙ্কর দত্তগুপ্ত, অমল ব্যাপারী, চন্দ্রানী ব্যাপারী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গবেষণাকার্য চলাকালীন যারা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন মালিনী ঘোষ, শিল্পা মন্ডল, প্রসেনজিৎ নস্কর, দীপ শঙ্কর নাইয়া, কৃষ্ণ কুমার সরকার, অঙ্কন রায়, সুমন সরকার, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। এদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

সঙ্ঘমিত্রা দাস
গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

সূচিপত্র

মুখবন্ধ *iv-v*

ভূমিকা ১-২২

- ক. পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন
- খ. গবেষণামূলক প্রশ্ন
- গ. উৎস-উপাদান এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি
- ঘ. অধ্যায়গত আলোচনা

প্রথম অধ্যায়:

উদ্বাস্তু অভিবাসন-ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা ২৩-৬০

- ১.১. উদ্বাস্তু আগমনের ধারা
- ১.২. দেশভাগজনিত উদ্বাস্তুদের শ্রেণিবিভাগ
- ১.৩. সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তুদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য
- ১.৪. চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তুদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য
- ১.৫. উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে সরকারি পদক্ষেপ
- ১.৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে সরকারি নীতির পর্যালোচনা
- ১.৭. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ত্রাণ ব্যবস্থা
- ১.৮. উদ্বাস্তু শিবির প্রতিষ্ঠা
- ১.৯. উদ্বাস্তু শিবিরে সরকারি সহায়তা
- ১.১০. উদ্বাস্তু শিবির বন্ধের সিদ্ধান্ত
- ১.১১. সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থা, পুনর্বাসনে সরকারের নানান পদক্ষেপ
- ১.১২. তৎকালীন পরিস্থিতিতে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগ
- ১.১৩. সরকারের আর্থিক সহায়তা

দ্বিতীয় অধ্যায়:

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন: মুখের কথায় ইতিহাস ৬১-১০০

- ২.১. উদ্বাস্তুদের নিজ তাগিদে কলোনি প্রতিষ্ঠা
- ২.২. আজাদগাড় কলোনি
- ২.৩. সংহতি কলোনি
- ২.৪. বিধান কলোনি ইউ বি (সন্তোষপুর)

- ২.৫. কাটজুনগর কলোনি
- ২.৬. পোদ্দারনগর কলোনি
- ২.৭. বিবেকনগর কলোনি
- ২.৮. কামালগাজি-লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি
- ২.৯. কুপার্স ক্যাম্প
- ২.১০. কলোনি ও ক্যাম্প প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়:

কলকাতা শহরতলির উদ্বাস্তু জীবন এবং সাংস্কৃতিক রূপায়ণ: পূর্ববর্তী অধিবাসী ও উদ্বাস্তু সম্পর্ক ১০১-১২৩

- ৩.১. নিজভূমির স্মৃতি
- ৩.২. উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের ব্যবহার
- ৩.৩. উদ্বাস্তুদের পারস্পরিক সহযোগিতা
- ৩.৪. শিক্ষাকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের প্রয়াস
- ৩.৫. পেশাগত পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া
- ৩.৬. সাংস্কৃতির প্রসার
- ৩.৭. রাজনৈতিক টানাপোড়েন
- ৩.৮. পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি আঞ্চলিক মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

চতুর্থ অধ্যায়:

উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকট: নির্বাচিত সাহিত্য ও স্মৃতির সারণীতে ১২৪-১৪৬

- ৪.১. শিক্ষা
- ৪.২. পারিবারিক জীবন
- ৪.৩. জীবিকা
- ৪.৪. উদ্বাস্তু রাজনীতিতে নারী
- ৪.৫. ক্যাম্পে উদ্বাস্তু নারী ও তাদের আন্দোলন
- ৪.৬. শহরের কলোনির উদ্বাস্তু নারী ও শহর থেকে দূরে কলোনি ও ক্যাম্পের নারীদের মধ্যেকার পার্থক্য

উপসংহার ১৪৭-১৫০

সংযোজনী ১৫১-১৫৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৭-১৬৮

ভূমিকা

দেশ বিভাজন এবং উদ্বাস্তু অভিবাসন ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যে ঘটনায় নিমজ্জিত রয়েছে অগণিত মানুষের তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনা। এই বিভাজনে বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠী শুধুমাত্র তার বাস্তুভিটে হারায়নি, হারিয়েছিল নিজের পরিচয়ও (identity)। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে আসা অসহায় বাস্তুহারা মানুষরা 'উদ্বাস্তু' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই ছিন্নমূল মানুষগুলি নিজেদের জীবনের চরম বিপদের দিনে আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে নতুন জায়গায় নিজেদের ঠাঁই খোঁজার জন্য লড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে উদ্বাস্তু কলোনি নির্মাণ করেছে। এই কলোনিগুলিকে 'দেশভাগের স্মারক' বলা যেতে পারে।[1]

দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম ও উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা পত্রটির কথা ভাবা হয়েছে। যাঁদের ত্যাগ, বঞ্চনার উপর নির্ভর করে স্বাধীন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিস্থাপন হয়েছে তাঁদের স্মরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে সেভাবে আলোচনা করা হয়নি বলে, একে 'ইতিহাসের এক অদ্ভুত মূক-বধির অবস্থান' বলে ভাবা হয়।[2] উদ্বাস্তু কিংবা অভিবাসন নিয়ে গতানুগতিক আলোচনা বহুবার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অভিবাসনে, কলকাতার শহরতলির উদ্বাস্তু জবরদখল কলোনির কথা সেভাবে পাওয়া যায় নয়। তাই এই গবেষণাতে এমন কতগুলি উদ্বাস্তু কলোনির কথা বলা হয়েছে, যাদের নিয়ে সেভাবে ভাবা হয়নি। কিভাবে এই কলোনি গড়ে ওঠে তা ভাবা দরকার। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার সংযোগে নতুন আঙ্গীকে শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ বিভাজনের পর পশ্চিম পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে অভিবাসিত হয়ে যে মানুষেরা উদ্বাস্তু বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছানোর পর তাঁদের কি হল, কেমন করে তাঁদের জীবন প্রতি মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল এ বিষয়ে তেমন আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। এই অভাববোধ থেকেই উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনাকে এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়রূপে ভাবা হয়েছে।

---

[1] Debjani Sengupta, *The Partition of Bengal Fragile Borders and New Identities*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

[2] Joya Chatterjee, *Bengal Divided Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

(ক) পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু অভিবাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়েছিল দেশভাগের পরেই। কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক গবেষণার ধারা শুরু হয় ১৯৯০ এর দশক থেকে। কান্তি পাকড়াশি তাঁর- 'The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal'[3] (১৯৭১)এ বলছেন, দেশবিভাজন কেবল আঞ্চলিক ভাগাভাগির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার চেয়েও অনেক বিস্তর ক্ষেত্র রয়েছে এর। এটা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের ভাগাভাগি। তাঁর আলোচনাতে 'উদ্বাস্তু' মানুষদেরকে বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে না দেখে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবেই দেখা হয়েছে। তবে অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে তৎকালীন সমাজের চিত্র বদলে যাচ্ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি তাঁর আলোচনাতে।

জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে তাঁর- 'Remembering Partition: Violence, Nationalism and History of India'[4] (২০০১) তে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশবিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসনকে দেখেছেন।

প্রণতি চৌধুরীর 'Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distribution of Refugees Settlements within the CMD'[5] (১৯৮৫) তে শুরু হয় দেশভাগের ইতিহাস রচনায় দেশভাগের ভুক্তোভুগী উদ্বাস্তু মানুষদের নিয়ে কথা বলা। ইতিহাসে এই গোত্রের অন্যতম স্মরণীয় লেখা দীপেশ চক্রবর্তী'র- 'Remembered Villages: Representations of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of the Partition'।[6]

মহিলা উদ্বাস্তুদের নিয়েও কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে যেমন গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের 'Coming out of Partition: Refugees Woman of West Bengal'[7] (২০০৫) যেখানে স্মৃতি কথার মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু মহিলাদের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন।

---

[3] Kanti Pakrasi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal*, Calcutta: University of Calcutta, 1971.

[4] Gyanendra Pandey, *Remembering Partition: Violence, Nationalism and History of India*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[5] Pranati Chaudhuri, *Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlements within the CMD*. Occasional Paper No. 55, Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences. 1985.

[6] Dipesh Chakrabarty, "Remembered Villages: Representation of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of Partition," *Economic and Political Weekly*, August 10, 1996, 133-152.

[7] Gargi Chakraborty, *Coming out of Partition: Refugees Woman of West Bengal*, New Delhi: Bluejay Books, 2005.

অর্চিতা বসু গুহ চৌধুরী'র 'Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women'[8] (২০০৯) থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মহিলা কেন্দ্রিক বিষয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে আসার পর কিভাবে উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবন বদলে গিয়েছিল সে বিষয়ে এই আলোচনা।

মৌসুমী মণ্ডলের (২০২১) 'Everyday Tactics: Analyzing the East Bengali Migrant Working Women's Everyday Practices in the Post Partitioned Calcutta'[9] তে তিনি দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীর উদ্বাস্তু মহিলাদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে শহরের উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবনধারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুমনা দাশ সুরের 'দেশভাগঃ স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা' মূল্যবান (২০২২)[10] তে তিন প্রজন্মের উদ্বাস্তু মেয়েরা, তাদের সমাজ, শিক্ষা, সংসার জীবনের বিভিন্ন দিক এবং প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া উদ্বাস্তু জীবনের নানা পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ের আলোচনায়।

তিস্তা দাস তাঁর 'Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal' (২০২৩) এ শহরের উদ্বাস্তু মহিলাদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি শহর থেকে দূরে ক্যাম্পে ও কলোনিতে উদ্বাস্তু মহিলাদের কথাও বলেছেন। অভিবাসন কিভাবে মহিলাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল, বাড়ির বাইরের জগতের সাথে পরিচিত করেছিল সেই বিষয়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে আবার চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক, পারিবারিক ও সামাজিক বাধা কিভাবে তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে দেয়নি সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন 'The Women of the 1950s' অধ্যায়টিতে।[11]

১৯৫০ এর সময় থেকে দেশভাগের ফলে প্রভাবিত মানুষদের অর্থাৎ 'উদ্বাস্তু'দের নিয়ে ভাবনা শুরু হলেও। 'উদ্বাস্তু' প্রসঙ্গ আলোচনা কিছুটা নতুন আঙ্গিকে ভাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন কিভাবে উদ্বাস্তুরা নিজেদের জায়গা দখলের লড়াই লড়েছেন, কিংবা কিভাবে 'উদ্বাস্তু

[8] Archit Basu Guha-Choudhury, "Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women." *Economic and Political Weekly*, vol. 44, no. 49, Dec. 2009: 66–69.

[9] Mousumi Mondal, "Everyday Tactics: Analysing the East Bengali Migrant Working Women's Everyday Practices in the Post-Partitioned Calcutta". In Supriya Agarwal, Neha Arora and Ved Prakash (eds), *Understanding Marginality: Cultural and Literary Perspectives*. Delhi: Rawat Publications, 2021.

[10] সুমনা দাশ সুর, *দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা*, কলকাতা: গাংচিল, ২০২২।

[11] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*, New York: Routledge Publication, 2023, p. 150.

কলোনির নির্মাণ' হয়েছে। কিভাবে একটি নতুন দেশে এসে, উদ্বাস্তু থেকে সেই দেশের নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি বর্তমান সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক। উদিতি সেনের 'Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition'[12] (২০১৮)এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। উদ্বাস্তুদের অধিকার, পুনর্বাসন এবং নিম্নবর্ণের মানুষ ও যে মহিলারা একা ছিলেন, যারা বিধবা উদ্বাস্ত মহিলা ছিলেন সেইসব প্রসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের যথাযথ নাগরিকত্বের অধিকারের কথা বারবার বলেছেন। উদ্বাস্তুদের এই ভূমিহীন হওয়া শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তের বিষয় নয়, এটা সময়ের সাথে সাথে বারংবার বাস্তবায়িত হয়েছে। গৃহ ত্যাগ করে অন্য গৃহের সন্ধান করেছে বারবার উদ্বাস্তু মানুষেরা। আবার অনেকের এই সন্ধানকার্য অসমাপ্তই থেকে গিয়েছে আমৃত্যু।

(খ) গবেষণামূলক প্রশ্ন

কলকাতা সংলগ্ন দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তুদের অভিবাসন ও তার জন্য ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্নতার কথা মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার কথা ভাবা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা পূর্ণতা দিতে পরোক্ষ উপাদানের সাথে সাথে সমীক্ষার প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে। কলোনির অন্তর্নিহিত ইতিহাস জানার জন্য কলোনিবাসী যাঁরা বয়সের ভারে জর্জরিত অথচ যাঁদের মর্মাহত স্মৃতি আজও জীবন্ত, তা ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষ মূল্যবান রসদ।

এই গবেষণার মাধ্যমে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে -

- উদ্বাস্তু অভিবাসনে ও পুনর্বাসনে সরকারের কি ভূমিকা ছিল?
- কিভাবে উদ্বাস্ত কলোনি, জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে?
- পূর্ববর্তী অধিবাসী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে পারস্পারিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন কি গড়ে উঠেছিল?
- উদ্বাস্তু কলোনি নির্মাণে কলোনি কমিটির কি কাজ ছিল?
- কিভাবে এবং কেন সমগ্র ১৯৫০ এর সময়কাল ধরে কলোনির ভিতরে একের পর এক স্কুল নির্মাণ হয়েছে?

[12] Uditi Sen, *Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition*, London: Cambridge University Press, 2018.

- কলকাতা শহরতলীর উদ্বাস্তু মহিলারা কিভাবে নিজেদের বদলে ফেলেছিল ও কেন এই বদল প্রয়োজন ছিল?
- ক্যাম্পের যে উদ্বাস্তু মহিলারা ছিল তাদের সাথে শহরতলীর উদ্বাস্তুদের কি ধরণের পার্থক্য ছিল এবং উভয়ের মধ্যেকার এরূপ পার্থক্যের কারণ কি ছিল?

এই সমস্ত প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তরসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

(গ) উৎস-উপাদান এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি

যারা দেশবিভাজনের মূল ভুক্তভোগী তাদের স্মৃতি কিভাবে এই ঘটনাকে এবং তার সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষদের দেখেছে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উর্বশী বুটালিয়া[13], বীণা দাস[14], রীতু মেনন[15], কমলা ভাসিন এঁরা প্রধাণত নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্মৃতি নির্ভর ইতিহাস লিখেছেন। তাঁরা নিজেরা ঘটনাকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যেভাবে ঘটনাকে দেখেছেন সেইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষক এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়ায় এই গবেষণার মূল প্রাথমিক উপাদান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা নির্ভর মৌখিক সাক্ষাৎকার বা ওরাল ন্যারেটিভ। এই স্মৃতি কিভাবে এই গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তা বোঝা দরকার।

ভারতে গবেষণার ক্ষেত্রে 'স্মৃতি' ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু যদি আমরা পাশ্চাত্য ইতিহাস পর্যবেক্ষন করি, তাহলে দেখা যায় সেখানে অনেক আগেই স্মৃতি নির্ভর গবেষণার কাজ হয়েছে। যেহেতু, আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মূল বিষয় 'উদ্বাস্তু অভিবাসন' তাই এই প্রসঙ্গে জানার জন্য যারা এই ঘটনার ভুক্তোভুগী তাদের স্মৃতিকথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। এক্ষেত্রে স্মৃতিকথা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণের পূর্বে, 'স্মৃতি' এবং 'মৌখক সাক্ষাৎকার' এই বিষয়গুলি নিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিভাবে ভাবা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত যখন বর্তমান সন্দর্ভে ব্যবহৃত উৎসসমূহ অনেকক্ষেত্রেই স্মৃতিনির্ভর।

---

[13] Urvashi Bhutalia, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*, New Delhi: Penguin Books, 2017

[14] বীণা দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, কলকাতা: র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, ২০১৫।

[15] Ritu Menon and Kamla Bhasin, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*. New Delhi: Kali for Women. 1998.

সর্বপ্রথম যেটা বোঝা প্রয়োজন তা হল আমরা কাকে স্মৃতি বলব। স্মৃতি'র ইংরাজী 'memory'। এই 'memory' কে বাট্রান্ড রাসেল[16] দুটিভাগে ভাগ করেছেন – (ক) 'Habit memory' (খ) 'Recollective memory'।

ফার্লং তার 'A Study in Memory'[17]তে স্মৃতিকে কেন্দ্র করে নতুন এক ধারার উল্লেখ করেছেন, 'Propositional memory'। আমাদের মনের ভিতরের যাবতীয় তথ্যসমূহ এর মধ্যে পড়ে।

'Habit memory' এবং 'Propositional memory'-এর বাইরে রয়েছে অভিজ্ঞতার বিচরণক্ষেত্র। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিষয়ক স্মৃতিকে 'recollective memory' আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, স্মৃতি মাত্রই আখ্যান। আর তাই প্রতিটি স্মৃতিই আসলে আখ্যান রচয়িতার নির্বিকল্প ব্যক্তিগত নির্মাণ। অর্থাৎ একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ ঘটনাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেটাই স্মৃতি।

এই প্রসঙ্গে জন লক তার- 'An Essay Concerning Human Understanding'[18] বইতে বলেছেন যে আমরা যা জানি বলে ভাবি, বাস্তবে তা আমাদের 'স্মৃতি' কারণ তার অনেকটা হল 'perception' আর 'imagination' এর মিশ্রণ, অর্থাৎ ধারণা আর কল্পনা। এই গবেষণাতে উদ্বাস্তু নাগরিকদের সাক্ষাৎকারকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে মুখের কথার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনির কথা বলা হয়েছে যেখানে কলোনি গড়ার কারিগরদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির নানান কথা, ঐতিহ্য, যাপনের কথা ধরার চেষ্টা করা। এই গবেষণাতে মূলত সাক্ষাৎকার কে কিভাবে ওরাল হিস্ট্রিকে মেথডোলজি হিসেবে ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা বোঝার আগে প্রয়োজন এই পদ্ধতি নিয়ে কি ধরণের আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা।

[16] Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, New York: Routledge Classics, 2016, p. 56.
[17] E. J. Furlong, *A Study in Memory: A Philosophical Essay*, London: Thomas Nelson, 1951.
[18] John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, London: Penguin Classics, 1997.

মাইকেল রস তাঁর আলোচনাতে বলছেন যে মানুষ নিজেকে যেভাবে নির্মাণ করতে চায় নিজের স্মৃতিগুলিকেও সেই আদলে সাজিয়ে নেয়।[19]

দেশবিভাজন কারোর কাছে সরাসরি যাপনের ইতিহাস আবার কারোর কাছে পরোক্ষ ছুঁয়ে থাকার ইতিহাস। বিভাজন কোন পরিস্থিতিতে হয়েছিল তার ইতিহাস বহুবার চর্চিত হয়েছে। কিন্তু এর সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গে খুব কম কথাই বলা হয়েছে। সেই বিষয় নিয়েই এই আলোচনা।

এই গবেষণা সমীক্ষা ভিত্তিক-ও বটে। গবেষণাতে চেষ্টা করা হয়েছে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনির অতীত ও বর্তমানকে জানতে। এই কলোনির মানুষদের জীবনের কথা, অভিজ্ঞতা, তাঁদের কাছ থেকে জানা হয়েছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। এই কাজের জন্যই প্রয়োজন হয়েছে সমীক্ষার বা ফিল্ড সার্ভের। মানুষের মুখের কথার ভিত্তিতে যখন ইতিহাস লেখা হয় তখন সেটা হয় মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি। এখন জানা দরকার যে মৌখিক ইতিহাস কি? এবং এই গবেষণার পরিসরে কিভাবে মৌখিক ইতিহাসকে ভাবা যেতে পারে।

১৯৬৭ সালে 'The History Workshop Movement' হয়। তখন ইতিহাসে নতুন মেথোড নিয়ে বহুল চর্চা হয়। এই সময় থেকেই জনসাধারণের ইতিহাস বা 'People's history' নিয়ে আগ্রহ বাড়ে এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে ইতিহাস রচনার কাজ হয়েছে। মানুষের স্মৃতি নির্ভর তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষাপত্র তৈরির পাশাপাশি অডিও ক্যাসেট, রেকর্ডার কিংবা বর্তমান সময়ে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যে মাধ্যমই হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি যেন শান্তিতে সাবলীলভাবে তাঁর নিজের কথা বলতে পারেন।

[19] Michael Ross, and Qi Wang. "Why We Remember and What We Remember: Culture and Autobiographical Memory." *Perspectives on Psychological Science* 5, no. 4 (2010): pp. 401–9.

Lummis (১৯৮৭)[20], Douglas (১৯৮৮)[21], Finnegan (১৯৯২)[22], Yow (১৯৯৪)[23], Ritchie (১৯৯৫)[24], Thompson (২০০০)[25] এদের লেখা থেকে বোঝা যায় একটা দীর্ঘ সময় জুড়েই এই ধরণের ইতিহাস চর্চা চলেছে।

এই ইতিহাসের কাজ শুধুমাত্র কি ঘটেছিল, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই ঘটনা সম্পর্কে একজন মানুষের কি অভিমত, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এই সমস্ত দিকেই খেয়াল রাখে এই প্রাথমিক উপাদান। অতীতের নানা ঘটনার একটা সামগ্রিক, সম্পূর্ণ নির্ভুল ছবি তুলে ধরতে অনেক সময় লিখিত নথি, তথ্য, পরিসংখ্যান, ছবি, ম্যাপ, ডাইরি, চিঠি ইত্যাদি সূত্রে ফাঁক থেকে যায়। আবার অনেক বিষয় ইচ্ছাকৃতও এড়িয়ে যাওয়া হয়। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘটনার সাক্ষী তাঁরা ঐ ঘটনা সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলেন বা দিকের সন্ধান দিতে পারেন যা আগে ভাবা হয়নি। সেই ফাঁক পূরণ করে ওরাল হিস্ট্রি।

সিন ফিল্ডের মতে ওরাল হিস্ট্রি গতানুগতিক ইতিহাস রচনায় শাসকশ্রেণির প্রতি রাজনৈতিক ও সামাজিক পক্ষপাতিত্বকে অস্বীকার করে।[26] বর্তমান সময়ে ইতিহাসের কাজে যে সকল ঐতিহাসিকরা এই উপাদানের ব্যবহার করেন তারা তাদের বক্তব্যের সাপেক্ষে যুক্তি দেন যে তারা 'প্রান্তিক মানুষ'দের কথা তুলে আনছেন যাদের কথা সাধারণত শোনা হয় না। এই ধরণের ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন 'first person witness' অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন মানুষের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ওরাল হিস্ট্রিতে একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবার এই ইতিহাস কে 'a positivist, fact driven, uncritical approach to memory and the past' বলেও সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

---

[20] Trevor Lummis, *Listening to History: The Authenticity of Oral Evidence*, New York: Barnes and Noble Books, 1987

[21] Douglas M. Costle: *US EPA Oral History Interview*, BiblioGov, 2013.

[22] Ruth Finnegan, *Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices*, New York: Routledge Publication, 1992.

[23] Valerie Raleigh Yow, *Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists*, UK: Sage Publication, 1994.

[24] Donald A. Ritchie, *Doing Oral History: A Practical Guide*, New York: Oxford University Press, 2003.

[25] Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, New York: Oxford University Press, 2000.

[26] Sean Field, *Oral History Methodology, Published by South- Exchange Programme for Research on the History of Development*, Amsterdam: (SEPHIS), 2007.

জোয়ানা বর্নাট তাঁর 'Oral History and Qualitative Research'এ মৌখিক ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন এটি হল একটি সংমিশ্রণ ও সমাহারের ইতিহাস। এটি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা যোগসূত্র নির্মাণের মাধ্যমরূপে কাজ করে। যেমন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা স্থানকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতাকে জেনে নেওয়া হয়। এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকেও মান্যতা দেয় অতীত ও বর্তমান সমাজকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে।[27] মৌখিক ইতিহাসের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় যার যথাযথ ব্যাখ্যা দরকার। নাহলে 'lack of documentation' সমস্যা তৈরি হয়। শুধু তাই নয় সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের একটা নিজস্ব স্বর থাকে তাঁদের স্মৃতিতে। তাঁদের শৈশব কাল, জাতিগত- শ্রেণিগত বৈরীতা, স্থানচ্যুতি, অভিবাসন, প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত পরিচয়, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের নিজেস্ব একটা প্রেক্ষিত থাকে। আর এখান থেকেই আসে ওরাল হিস্ট্রির প্রসঙ্গ।

গিডেন্স বলছেন, 'self identity'র কথা। যাঁরা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি, সময়ের সঙ্গে পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব কমে এলেও নিজের জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেলেও, তাঁদের জীবনে 'স্মৃতি' গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে, তিনি বারবার ফিরে যেতে চান গৌরবময় অতীতে।

এই বিষয়ে পল থম্পসনের 'The Voice of the past as a life- story interview guide' (third edition) যেমন প্রাসঙ্গিক, আবার 'From: Texas Historical Commission; Fundamentals of Oral History: Texas Preservation Guidelines' গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে যে সত্যিকারের ঐতিহাসিক তথ্য বা রেকর্ড পাওয়া যায় সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাতে। এই বাঁচার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা কেবল একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্মেই সঞ্চারিত হয় না, এটা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইতিহাস লেখার উপাদান যাতে স্মৃতির ভাষ্যের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে।[28]

সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে, যে সমীক্ষক তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে একাধিক সময় বিরাজ করছে। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে, যে সময়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে এবং যে সময়ের কথা সাক্ষাৎকারে উঠে আসছে সেগুলো পৃথক। প্রজন্মভিত্তিক সময়ের ব্যবধান, ঐতিহাসিক সময় ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা কোন কোন সময়ে তা ঘটছে তা ক্রমান্বয়ে নথি ভুক্ত করতে হবে।

---

[27] Joanna Bornat, *Timescapes Methods Guides Series 2012 Guide No. 12*, 'Oral History and Qualitative Research', ISSN 2049-9248 (online).

[28] Paul Thompson, *The Voice of the Past. 3rd ed.*, New York: Oxford University Press, 2000.

প্রজন্ম ও বয়স অনুযায়ী বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । বৃদ্ধ বয়সের একজন লোক যেমন বক্তব্য পেশ করবেন, একই পরিবারের হয়েও, অন্য প্রজন্মের অন্য একজন পৃথক বা আলাদা ধরণের কথা বলবেন। এই বিষয়টা কে 'ego integrity' রূপেও দেখা হয়েছে। আবার পুরুষেরা এমন অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান, যে প্রসঙ্গে কথা বলতে মহিলারা সাবলীল কারণ সেটা তাদের নিরিখে জরুরি।

মানব স্মৃতির ধারাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব তা বোঝাই হল মৌখিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য। এলিস এম হফমেন, হাওয়ার্ড এস হফমেনের লেখা, 'Reliability and validity in oral history: The case for memory'-[29] একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মানব স্মৃতিকে আমরা ঠিক কতটা বিশ্বাস করতে পারি এবং এর গুরুত্ব কতটা বা স্থায়িত্বই বা কতটা? অনেক সময় দেখা যায়, একই ঘটনাকে প্রত্যক্ষদর্শীরা একেক রকমভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাহলে কিভাবে একটা ঘটনাকে যথাযথ বা সত্য বলে গণ্য করা যাবে? একটা নির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রসঙ্গে একজন ব্যক্তির প্রদেয় সাক্ষাৎকারের সাথে অন্যান্য প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে মিলিয়ে উভয়ের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য রয়েছে তার ভিত্তিতেই সত্যাসত্য বিচার করতে হবে। অন্যদিকে, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদানে ঐ ঘটনাকে নিয়ে কি কি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে এই বিষয়কেও মিলিয়ে দেখতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একই কথা বলেন, এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়। এটিকে বলা যেতে পারে - 'remarkable stability'- যার মধ্যে স্থিরতা যেমন রয়েছে আবার বিশ্বাসযোগ্যতাও রয়েছে। অন্যদিকে, 'লং টার্ম মেমোরি'কে এই ধরণের ইতিহাস রচনার আবশ্যিক ভাবা হয়। মানব স্মৃতি কে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করে বা কাজে লাগিয়ে অতীতের নানান ঘটনার একটা নির্ভর যোগ্য লিখিত উপাদানরূপে গড়ে তোলা হয়।

গবেষণার কাজে ওরাল হিস্ট্রির সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয়গুলিকে মনে রাখতে হবে। বলা হয়ে থাকে 'Oral history is the best method to use, however- to get an idea not only of what happened, but what past times meant to people and how it felt to be

[29] Alice M. Hoffman and Howard S. Hoffman, "Reliability and Validity in Oral History: The Case for Memory," pp. 107–135 in Jaclyn Jeffrey and Glenace E. Edwall (eds), *Memory and History: Essays on Recalling and Interpreting Experience*, Maryland: University Press of America, May 1, 1994.

a part of those times.' অনেক সময়ে ওরাল হিস্ট্রির সাথে ওরাল ট্র্যাডিশনকে এক করে দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। বাস্তবে কিন্তু দুটি আলাদা। এটি হল, একজন ব্যক্তি ও তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা তা গল্প, গান, কথা যা কিছু হতে পারে সেটি আরেকটা প্রজন্মে মৌখিকভাবে পোঁছে দেয়।

উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার সাক্ষাৎকার নিতে হবে এবং কোন বিষয়ের উপর নিতে হবে সেটা নির্ভর করে কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ বা রেকর্ড প্রয়োজন তার উপর। কাদের সাথে কথা বলা হবে, কাদের কথা জানা হবে ও কেন জানা হবে এবং কতটা জানা হবে এই বিষয়গুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত জীবন ইতিহাস, দ্বিতীয়ত বিষয় কি হবে, তৃতীয়ত থিমেটিক বিষয়, চতুর্থ বিষয়ভিত্তিক গবেষণা।

অন্যদিকে যখন জীবন ইতিহাস নিয়ে কাজ করা হয় তখন একজন ব্যক্তির ছোট থেকে তার বড় হওয়ার কথা জানাকে সেরা পদ্ধতি হল মৌখিক ইতিহাস। যখন কোনো পরিবার নিয়ে বা পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা হয় তখন গোষ্ঠীগত বা সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের কাজেও এই পদ্ধতি সহায়ক হয়।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বেশ কিছু বিষয় মাথায় রেখে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি যেমন:

- সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে নিজের কাজের সুবিধার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিতে হবে।
- প্রথমেই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে জানিয়ে দেওয়া জরুরি যে কি প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং সেই প্রেক্ষিতে তার সাক্ষাৎকার কতটা তাৎপর্যপূর্ণ।
- অনুমানমূলক প্রশ্ন না করাই শ্রেয়। এই কারণে বলা হয়ে থাকে- 'interviewing is an art' আবার অন্য দিকে এটাও বলা হয়ে থাকে- 'verification is the heart of historical inquiry'
- সাক্ষাৎকার বয়সভিত্তিক না প্রজন্মভিত্তিক নেওয়া হবে তা ঠিক করে নিতে হবে।
- লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।
- জাতি, বর্ণ, এই বর্গগুলো মনে রেখে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থান জরুরি কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।

- রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সংযুক্তিকরণ অনুসারে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিষয় সম্পর্কে আগের থেকে যতটা জেনে যাওয়া সম্ভব তা জানতে হবে।
- ব্যক্তির মনে যেন কোনো দ্বিধা, ভয়ের সঞ্চার না হয় সেইদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বাধীনভাবে নিজেদের মনের কথা ও অভিজ্ঞতার কথা সাক্ষাৎকারীকে বলতে পারেন সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- যে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ বা ক্ষেত্র প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হচ্ছে, তা ব্যতিরেক বহু কথা উঠে আসতে পারে যা হয়তো বা গবেষণার কাজের জন্য মূল্যবান নয়। কিন্তু সময়সাপেক্ষ হলেও ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। গবেষকের কাজ হল প্রয়োজনীয় বিষয় সাজিয়ে নেওয়া সাক্ষাৎকারের মধ্যে যে সাবলীলতা তা নষ্ট না করে।
- স্মৃতি নির্ভর অতীতচর্চা পুরোপুরিভাবে সঠিক না হলেও এর গুরুত্ব থাকায় না বলতে চাওয়া বিষয় বা যে প্রসঙ্গে নীরবতা পালন করা হয় তাও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বেশ কিছুক্ষণ পরে ফল আপ প্রশ্ন করতে হবে।
- কোনো জটিল বিষয় বা ভারাক্রান্ত করতে পারে এমন প্রশ্ন থাকলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে ঐ বিষয়ক প্রশ্ন সরাসরি করা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর এবং যার সাথে কথা বলা হবে বা হচ্ছে তার উপর।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে বা নির্দিষ্ট প্রশ্নের ঘেরাটোপে জেরবার করা যাবে না।
- সাক্ষাৎকার পর্ব যখন প্রায় শেষের দিকে তখন তাকে প্রশ্ন করতে হবে, এখানে কি এমন কিছু আছে যা জানতে চাওয়া হয়নি যা জানার দরকার আছে। এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করা হয় যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তার না ভাবা বিষয় বা প্রসঙ্গ তুলে আনার।
- সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সমালোচক হয়ে ওঠা যাবে না বা হঠাৎ করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রয়োজন হলে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী সমালোচিত বিষয় প্রথম দিকে এড়িয়ে যেতে হবে। সেটা সাক্ষাৎকারের শেষের দিকে করতে হবে।

যা জানতে চাওয়া হচ্ছে তার সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সূক্ষ্ম অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অধিক ধৈর্যের যেমন প্রয়োজন আবার অধিক সময়েরও প্রয়োজন। একটা চিন্তাশীল সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে, একজন সাক্ষাৎকারী এবং একজন সাক্ষাৎগ্রহণকারীর মধ্যে একটা

পারস্পারিক বিশ্বাসের সম্পর্ক নির্মিত হয়। যিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন এবং যাকে বলছেন উভয়ের মধ্যে যদি বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তাহলে কোনোভাবেই একটা যথাযথ সাক্ষাৎকার হতে পারে না।

বর্তমান গবেষকের অভিজ্ঞতা বলে যেহেতু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কাজ, তাই এক্ষেত্রে পারস্পারিক বিশ্বাস বা সম্পর্কের জায়গা নির্মাণ করা একেবারেই সহজ হয়নি। কারণ উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ বহমান একটি বিষয়, যেখানে বারবার প্রশ্ন উঠেছে তাঁদের পরিচয়ের, তাঁদের অস্তিত্বের। কিন্তু গবেষক নিজে একজন উদ্বাস্তু হওয়ায় কাজে বিশ্বাসের জায়গা গড়ে তুলতে কিছুটা সুবিধে হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা যদি বেশি করে নিজেদের কথা লিখতেন বা বলতেন, তাহলে এই ধরণের ইতিহাস রচনার কাজ এত বেশি কঠিন ও ব্যতিক্রমী হতো না। কিন্তু সমস্যা এখানেই, যে তাঁরা তাঁদের যন্ত্রনাময় অতীতের কথা লিখতে চাননি।

(ঘ) অধ্যায়গত আলোচনা

আমার গবেষণা পত্রটি মূলত চারটি অধ্যায় দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি অধ্যায় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্ন গুলির উত্তর সন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা।

প্রথম অধ্যায় উদ্বাস্তু অভিবাসন কখন ও কীভাবে, কোন সময়, কোন পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়েছিল, উদ্বাস্তুরা কোন কোন সময়ে অভিবাসিত হয়েছিল ও তার বিভিন্ন দিকগুলি দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হয়ে এলে সরকারের পদক্ষেপ কি ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গেরইবা এই প্রসঙ্গে কি ভূমিকা ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে, বিমান সমাদ্দারের ‘শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনিঃ আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান’,[30] একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উদ্বাস্তু কলোনির নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, তাঁর আলোচনাতে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে সরকারের কি ভূমিকা ছিল বা কতটা ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

[30] বিমান সমাদ্দার, *শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনি: আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান,* কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ পরিচালনার জন্য একেবারে শীর্ষ স্থানে ছিল 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর' (Refugee Relief and Rehabilitation /RRR Department)। এই দপ্তর কখন, কিভাবে নির্মিত হয়েছে, এর গঠনশৈলী (Structure of RRR Department), কারা এই দপ্তরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, কিভাবে এই দপ্তর উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে কাজ করেছে, তাদের কাজের ধরণ, তাদের কাজের সফলতা কিংবা বিফলতা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচ্য গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সরকারি রিপোর্ট, ম্যানুয়েল এবং হ্যান্ডবুক সমস্ত কিছুতে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে, সরকারের একাধিক পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা, তাদের কাজ করার পদ্ধতি, চিন্তাভাবনাতে নানান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে একাধিকবার। উদ্বাস্তু বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় তার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তু বসতি বা কলোনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে মৌখিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষের অতীত ও বর্তমান তাদের জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বদলে গিয়েছে তাদের জীবন, তা এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়। উদ্বাস্তু কলোনি কিভাবে গড়ে উঠেছে, কত রকমের কলোনি রয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য, কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কেন একটি কলোনি আরেকটি কলোনির থেকে পৃথক, কলোনি নির্মাণে কলোনি কমিটির কি ভূমিকা ছিল, কলোনি কমিটি কিভাবে কলোনিতে কাজ করেছে, কিভাবে এটি নির্মিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। কলোনি কমিটির পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ কিভাবে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে নিজেদের কাজ করেছিলেন তা দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বসতি নির্মাণে বা কলোনি স্থাপনে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন প্রয়োজন কিংবা অধিকার আদায়ে এই রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা কিভাবে কাজ করেছিল এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক।

মানচিত্র – ১.১: আজাদগড় কলোনি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান।

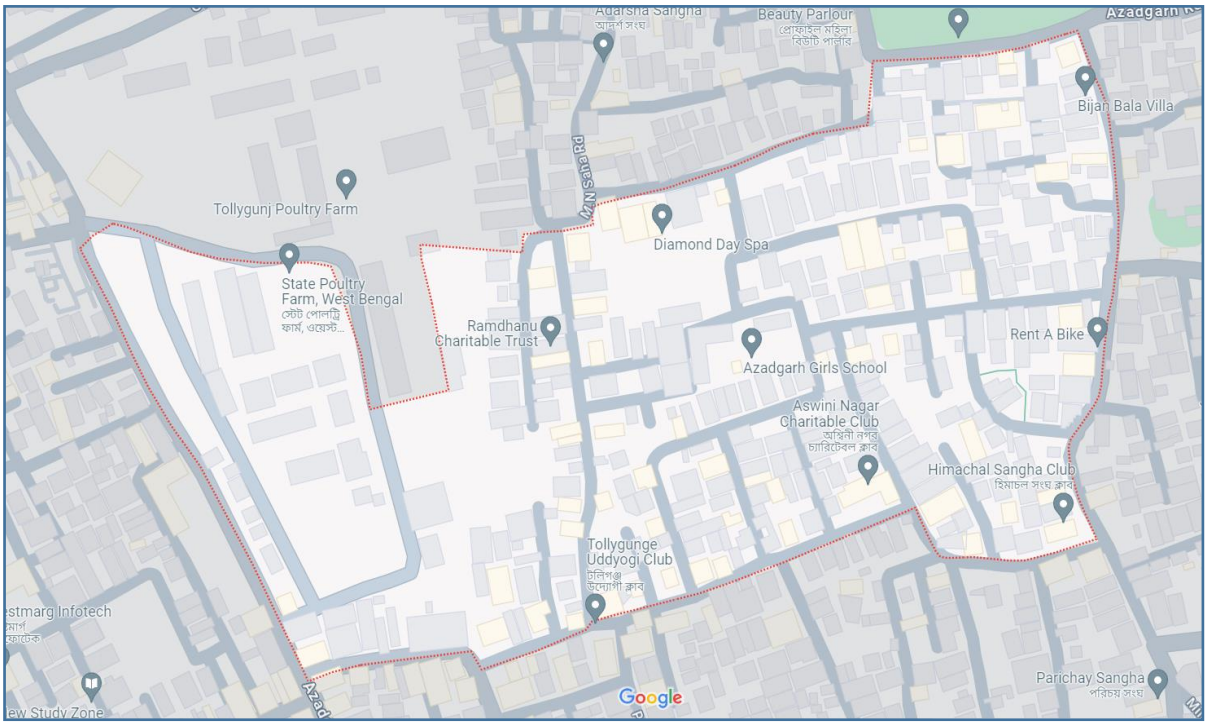

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.২: সংহতি কলোনি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান।

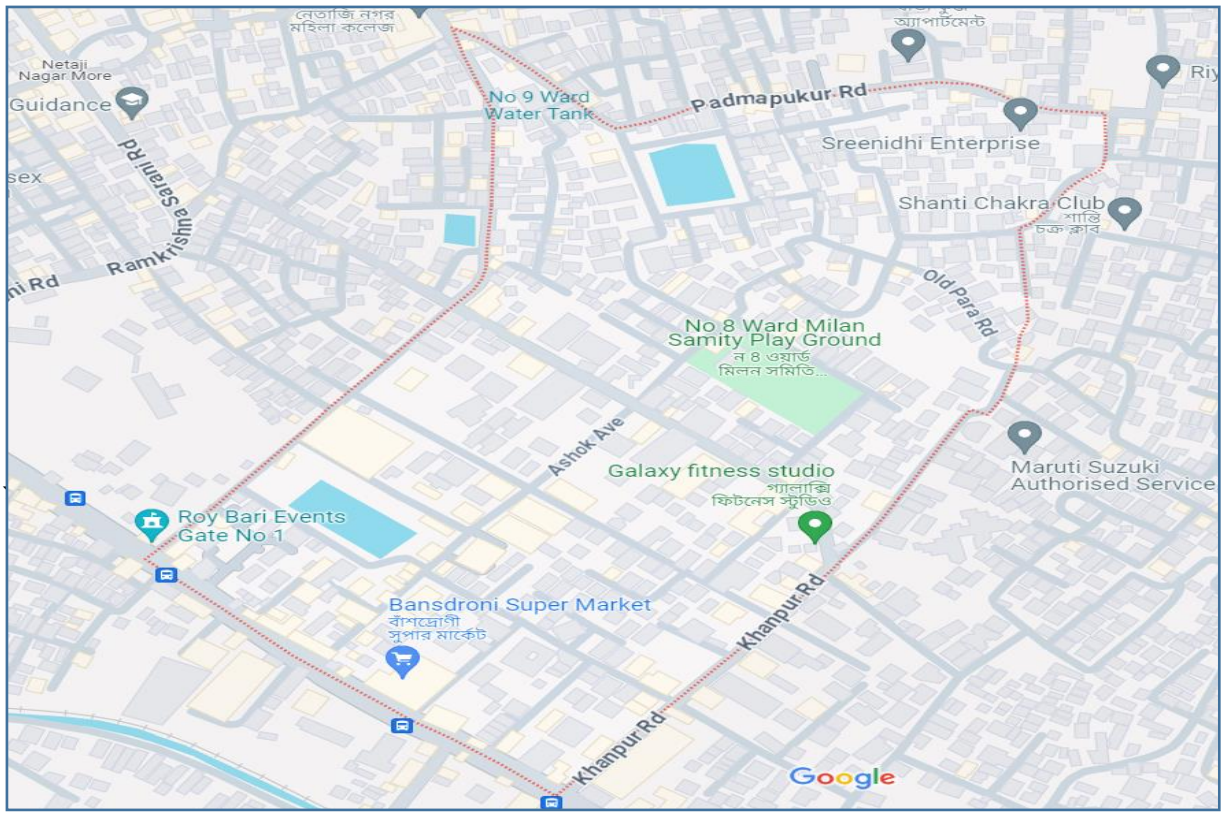

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৩: বিধান কলোনি ইউ বি (সন্তোষপুর) ভৌগোলিক পরিসর।

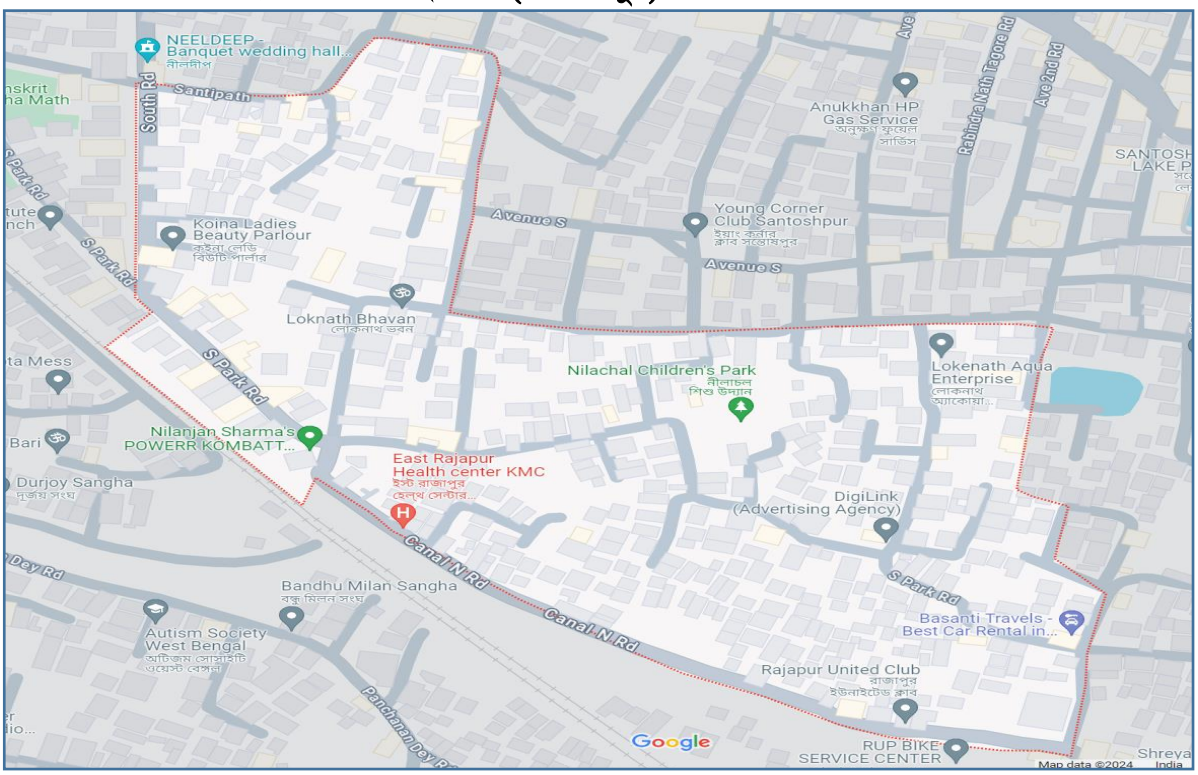

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৪: কাটজুনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

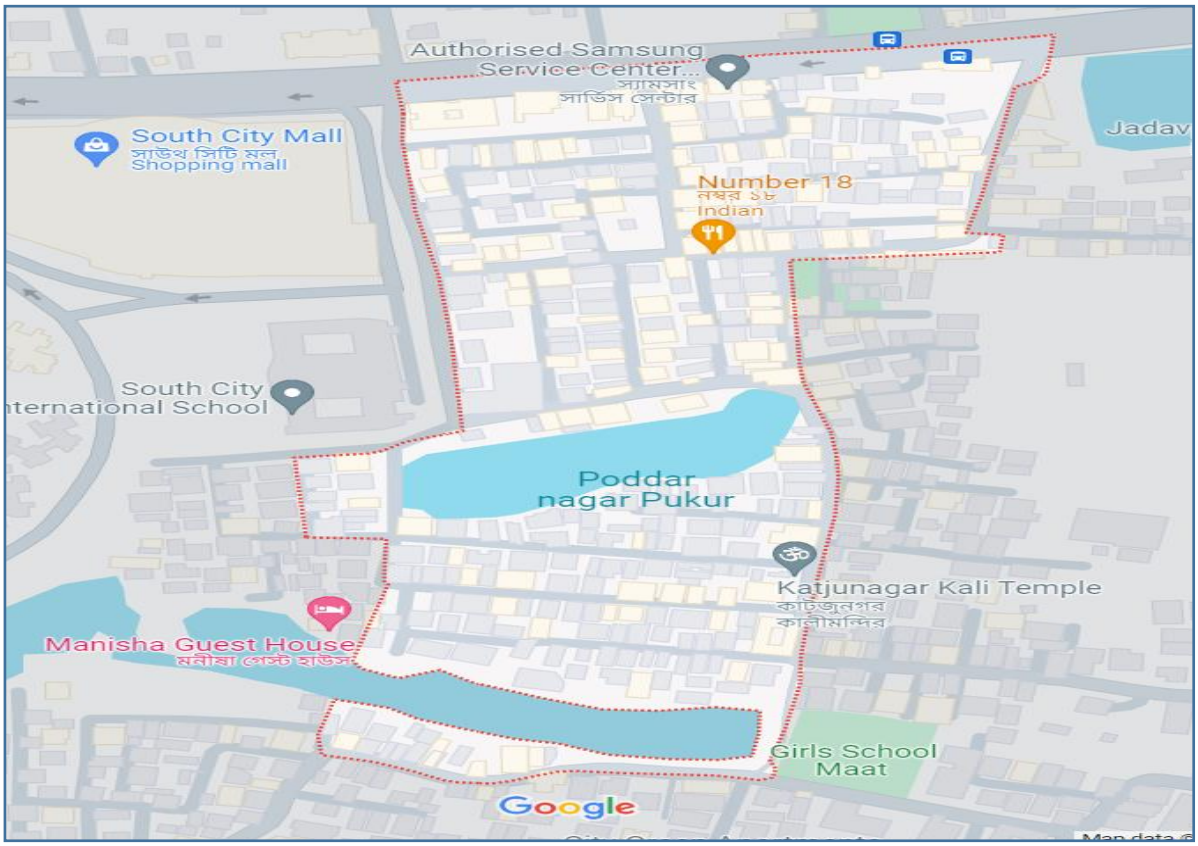

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৫: পোদ্দারনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

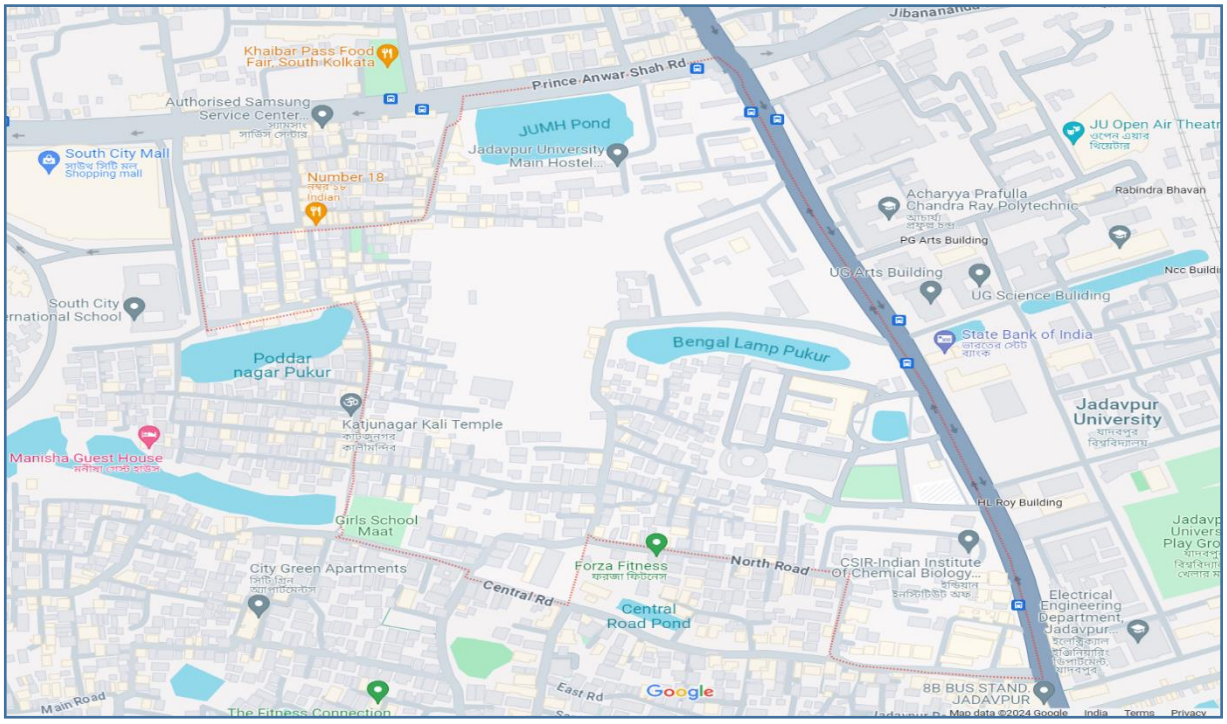

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৬: বিবেকনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

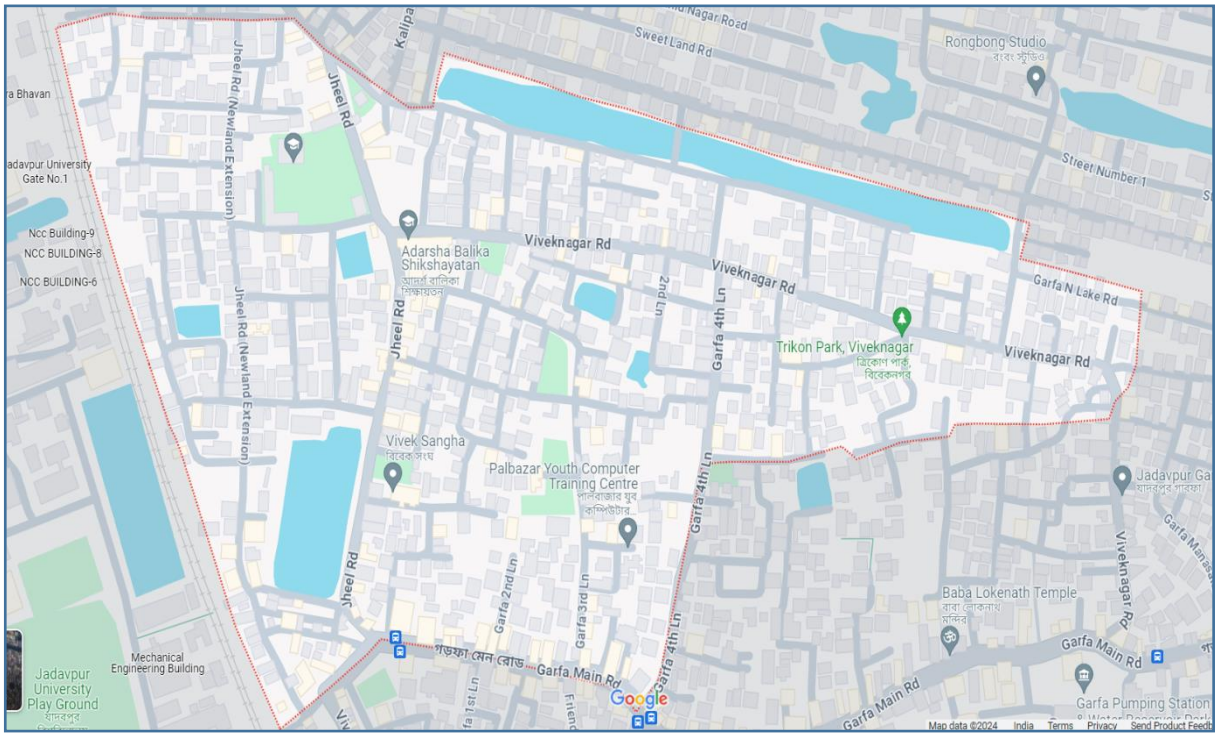

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৭: কামালগাজি- লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

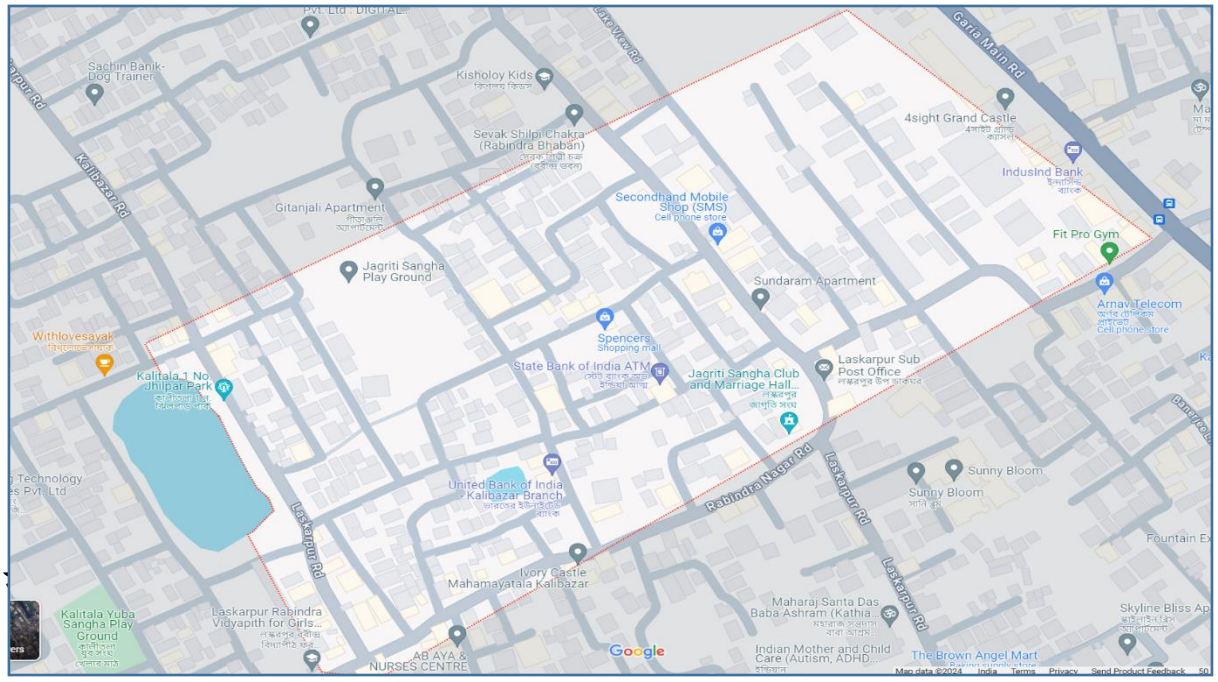

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৮: কুপার্স ক্যাম্প কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

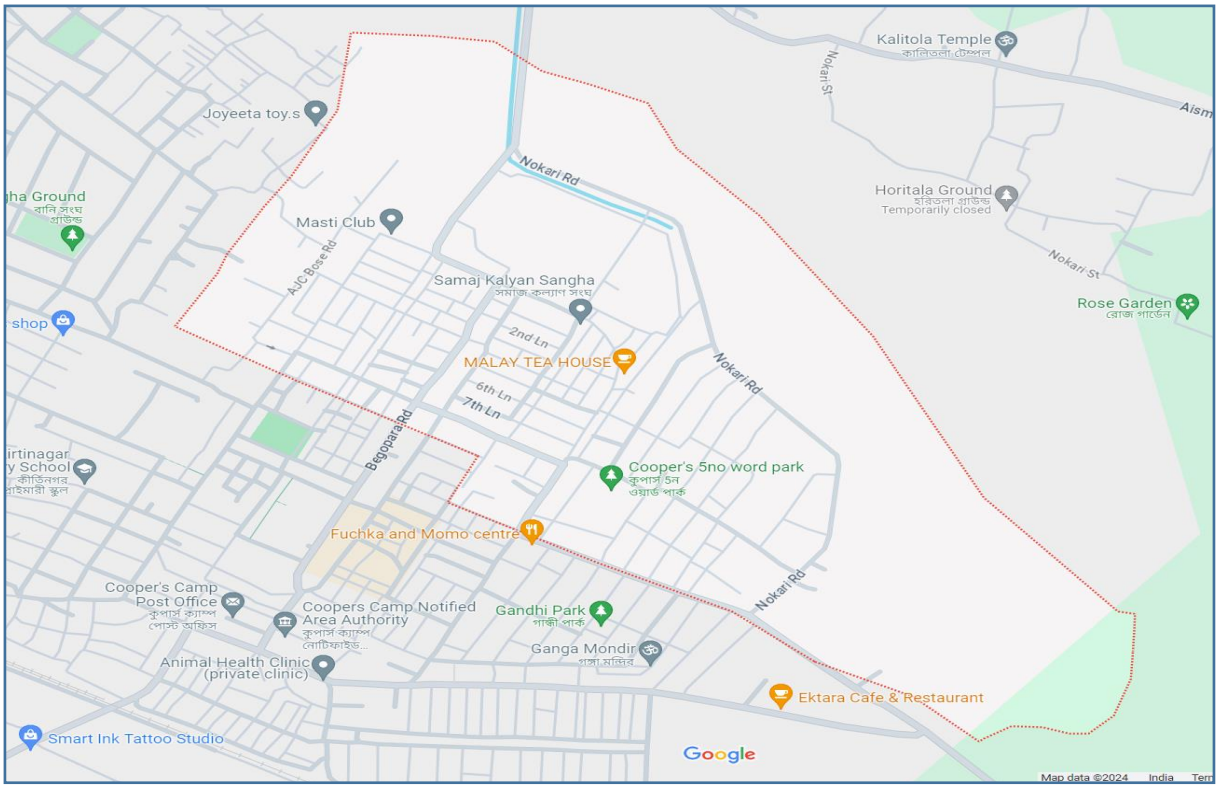

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৯: গয়েশপুর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

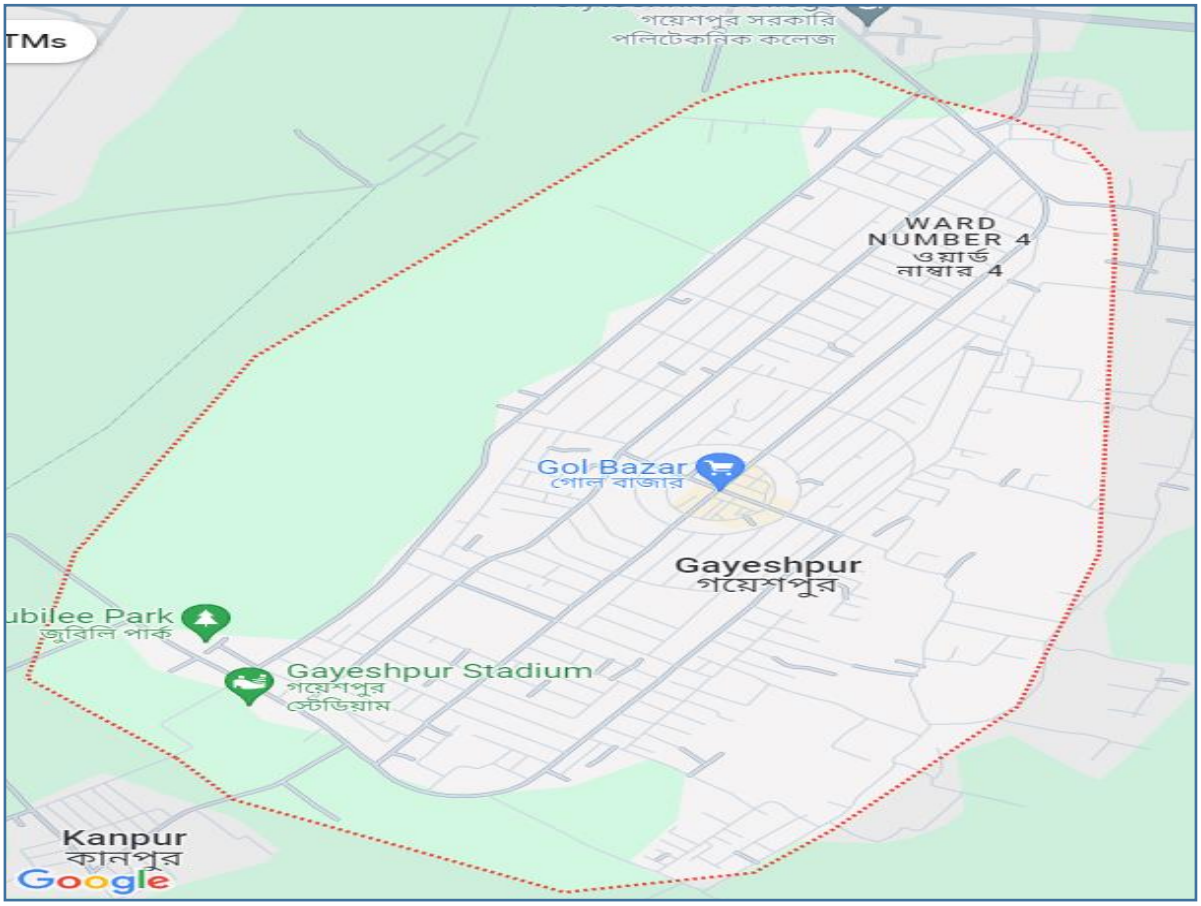

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

এই অধ্যায়ে বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। যেহেতু এই প্রসঙ্গ একটি বৃহৎ ও বিস্তারিত ক্ষেত্র, তাই আলোচনার সুবিধার্থে মূলত কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদের নিয়ে এর আগে কথা বলা হয়নি। অথচ এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির প্রতিটির নির্দিষ্ট কিছু ইতিহাস রয়েছে। আজও এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির বুকে শ্বাস নেয় দেশবিভাজনের অভিঘাত। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই উঠে এসেছে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্বাস্তু জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো। যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পোদ্দার নগর কলোনি, কাটজু নগর কলোনি, কামালগাজি লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি, সংহতি কলোনি, সন্তোষপুর বিধান কলোনি, বিবেকনগর কলোনি, আজাদগড় কলোনি।

নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে নতুন জীবন শুরু করেছে, কঠিন সময়ে জল সরবরাহ, জল নিষ্কাসন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার, জমির মালিকদের এবং তাদের ভাড়াটে গুন্ডাদের অত্যাচার, জঙ্গলময়

জায়গাতে সাপেদের উপদ্রব কিভবে উদ্বাস্তুরা মোকাবিলা করেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র বিবাদ বা বৈপরীত্য তুলে ধরেনি, তার সাথে মুখের কথায় উঠে আসে এমন তথ্য যা বন্ধ জানালা খুলে দেয়। অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক গুণাবলী, বেঁচে থাকার আন্দোলনের মতন প্রতিটি ক্ষেত্র এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তু জীবন, সাংস্কৃতিক রূপায়ন এবং পারস্পারিক দ্বান্দিকতা ও দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন, যার মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বাস্তু আসেন পশ্চিমবঙ্গে। আবার উদ্বাস্তু অভিবাসনের ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা অন্যতম। বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় দাঁড়িয়ে আছে এই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে থাকা উদ্বাস্তুদের জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানকে কেন্দ্র করে। এই শহরতলীর উদ্বাস্তুরা কি কারণে এই অঞ্চলকে নির্বাচিত করেছিল তা বিচার্য বিষয়। অভিবাসনের পর থেকে বর্তমান সময়ের নিরিখে, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তুদের জীবন কিভাবে বদলে গিয়েছিল তাদের এই বদল কোন পথে, কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা বিবেচ্য। বাঙাল- এদেশীয় সম্পর্কের টানাপড়েনও এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজকে সঠিকভাবে করার জন্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্বাস্তু সমাজের দ্বন্দ্ব-ও এই অধ্যায়ের মূল প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই দ্বন্দ্বকে মূলত দুটি ভাবে ভাগ করে আলোচনার প্রেক্ষিত নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার পারস্পারিক দ্বন্ধ। চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচারণে, খাদ্যাভ্যাসে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তাতেও তা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা, বরিশালের উদ্বাস্তুরা তাদের রান্নায় ঝালের ব্যবহার করেন অতিমাত্রায়, কিন্তু অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যেমন ফরিদপুর, নোয়াখালি এরা রান্নায় মিষ্টি ব্যবহার করেন। প্রত্যেকেই বাঙাল ভাষায় কথা বললেও, বাঙাল ভাষার টান বা কথা বলার ধরণ কিন্তু আলাদা। এগুলিকে আমরা ‘নোয়াখাইল্যা ভাষা’, ‘ঢাকাইয়া ভাষা’, ‘চাটগাঁইয়া ভাষা’, ‘ফরিদপুরি ভাষা’ এইভাবে একেকটা জায়গা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভাষাকে একেকরকম ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলি উদ্বাস্তুদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্টের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, একটা সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ কলোনি নির্মাণের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই ব্যক্তিই পরবর্তীকালে তার পরিবারে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। শুধু তাই নয় সংসারে, নিজ সন্তান, আঞ্চলিক প্রোমোটারদের বাড়াবাড়িতে, বাধ্য হয়েছে নিজের বাড়ি

জমি তাদের হাতে তুলে দিতে। আজ এককক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে গিয়েও মনের গভীরে তিনি আজও সযত্নে লালন করে চলেছেন তার উদ্বাস্তু জীবন, এই আলোচনা তাদের প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকটকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্য ও স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে। উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে যে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তু নারীকে 'নির্যাতিত', 'লাঞ্ছিত', 'অপমানিত', কিংবা 'ধর্ষিতা' রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু অভিবাসন এমন এক নারী সমাজেরও জন্ম দিয়েছিল যে নারী সমাজ বিদ্রোহ করতে শিখেছিল, যে নারী সমাজ সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কার, অন্ধকারকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শিখেছিল। এমনকি পারিবারিক জীবনে মাথা হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায় এই সকল মেয়েদের প্রসঙ্গে।

এই আলোচনাকে বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে একদিকে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির উদ্বাস্তু মহিলাদের কি কি আলাদা বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যেকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবন ধারার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় সেই বিষয়গুলিকে যেমন মনে রাখা হয়েছে, আবার অন্যদিকে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, পি এল ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প কিংবা গয়েশপুর কলোনির মহিলাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা ধরার চেষ্টা হয়েছে। তাদের সামাজিকবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সচেতনতার জায়গাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে মূলত কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্যিক উপাদান কে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কলোনি ও ক্যাম্পের উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদেরই মুখে, তাদের জীবনের নানান অভিজ্ঞতাকে ক্ষেত্র সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 'বাঙালি মহিলা' বা 'উদ্বাস্তু মহিলা' শুধুমাত্র উদ্বাস্তু ভদ্র মহিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্বাস্তু সমাজের দারিদ্র, কলোনি ও ক্যাম্পে বসবাসকারী মহিলাদের উদ্বাস্তু জীবন, পুনর্বাসন এবং কর্মজীবনে তাদের লড়াইয়ের কথাও গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পরে এক শ্রেণির নারীরা সমাজ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি নির্মাণের সুযোগ পেলেও, আরেক শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলাদের সেই সুযোগ এত সহজে আসেনি। কিন্তু একথা সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিতে হবেই যে, লড়াইয়ের পথ কঠিন হলেও, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র নারী সমাজের কাছে একটা 'আত্ম পরিচিতির জগৎ' নির্মাণের দরজা খুলে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শহরের কলোনির উদ্বাস্তু মহিলারা যেমন জীবিকার সন্ধানে প্রতিদিন সংগ্রাম করেছে, পরিবারিক দায়িত্ব পালন করেছে, একইভাবে পিছিয়ে থাকেনি শহর থেকে দূরে

ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তু মহিলারাও। তারা ক্যাম্পের আভ্যন্তরীণ নানান বিষয়ে জোটবদ্ধতা নির্মাণ করেছে, এক হয়ে প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে, পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। উদ্বাস্তু অভিবাসন জন্ম দিয়েছিল এমন এক নারী সমাজের যা বাঙালি হিন্দু সমাজ আগে কখনও দেখেনি। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, দেশবিভাজন শুধুমাত্র ধ্বংস বা বিপন্নতাই নিয়ে আসেনি ভয়ংকর দিনেও লড়াই করার অফুরাণ প্রাণ শক্তি যুগিয়েছিল।

প্রথম অধ্যায়

উদ্বাস্তু অভিবাসন-ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা

বিভাজন, অভিবাসন- সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখালেখি মূলত নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশভাগের কারণ এবং দেশভাগের ফলাফল অর্থাৎ অভিবাসন এই দুই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে, বিশদে আলোচনা হয়েছে। এই পরিচিত বর্গের বাইরে গিয়ে, উদ্বাস্তু অভিবাসন প্রসঙ্গকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশভাগের প্রতিক্রিয়া মর্মান্তিক এবং এর অভিজ্ঞতা ভিন্ন ও মিশ্রিত। রাজনৈতিক জটিলতায় না জড়িয়ে এর প্রতিক্রিয়া উদ্বাস্তু অভিবাসন এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দেশবিভাজনকে কে অনিবার্য করে তোলার যে প্রেক্ষিত নির্মাণ হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ লগ্নে তা পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান -এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে। দেশবিভাগ কেন হল তার রাজনৈতিক বহুল আলোচনা বহুবার হয়ে গিয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় উদ্বাস্তু অভিবাসন।

বিশ্বের একাধিক দেশে, বিভাজনের মত ঘটনা বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশবিভক্তির এরূপ বাস্তবায়নের পশ্চাতে কখনো জাতিগত জটিলতা আবার কখনো বিশ্ব রাজনীতি বা ঠান্ডা লড়াই কারণ হয়েছে। ভারতবর্ষে এই বিভাজনের কারণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভেদ। একদিকে পারস্পারিক ভুল বোঝাবুঝি, অন্যদিকে ভেদনীতির রাজনীতি ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগকে একটি অনিবার্য ঘটনায় পরিণত করে যার পরিণাম বা বাস্তব ফল দেশবিভাজন ও অভিবাসন।

দেশ ছাড়ার যন্ত্রণায় মর্মাহত মানুষেরা কিভাবে হারানো দেশের স্মৃতিকে পুঁজি করে, নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন এই আলোচনা সেই প্রসঙ্গেই। দেশভাগ বাঙালির স্মৃতিতে, বাঙালির মননে এক চিরকালীন রক্তক্ষরণের কারণ, যা আমাদের সামাজিক পরিমন্ডলে কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রেখে যায়। প্রশ্ন ওঠে কারা এই মানুষ দেশভাগের আঘাত যাদের আজও বয়ে বেড়াতে হয়? কেন তারা অভিবাসিত হলেন ও কিভাবে হলেন? অভিবাসিত হয়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে তারা যখন পশ্চিমবঙ্গে এলেন, তখন তাদের কি হল? এই চরম বিপর্যয়ে বা উদ্বাস্তু

অভিবাসনে সরকারের কি প্রতিক্রিয়া ও সরকারের পদক্ষেপ উদ্বাস্তু সমস্যার কতটা সমাধান করতে পেরেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেরই চেষ্টা করা হয়েছে এই নির্দিষ্ট অধ্যায়টিতে।

আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য অধ্যায়টিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমভাগে, দেশবিভাজনের হাত ধরে কখন ও কিভাবে উদ্বাস্তু অভিবাসন হচ্ছে? উদ্বাস্তু কাদের বলা হয়, কত ধরণের উদ্বাস্তু ছিলেন, তাদের বৈশিষ্ট্য কি, তারা ঠিক কোথায় একে অপরের থেকে পৃথক সেই প্রসঙ্গ নিয়ে নির্মিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়টির প্রথমধাপ।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে যে উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হয়ে এসেছিলেন সেই তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে, তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের ভূমিকা কি ছিল? তাদের কাজ কি ছিল উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে? তারা কতটা তৎপর ছিলেন? কিভাবে এমন একটি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তারা করেছিলেন কিংবা উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং কিভাবে নিয়েছিলেন? এই প্রসঙ্গেই এসে যায় উদ্বাস্তু ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়। এই সকল প্রসঙ্গ নিয়েই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ধাপটি নির্মাণ হয়েছে।

দেশবিভাজনকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে ফেললে একে একটা সীমাবদ্ধতা প্রদান করা হয়, কারণ এর মধ্যে এক চূড়ান্ত সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্র রয়েছে যা বিভাজনের ইতিহাসকে একটা অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। উদ্বাস্তুদের নতুন মাটি, নতুন খাদ্য, নতুন ভাষা, নতুন আদব-কায়দাকে রপ্ত করতে হয়েছিল। তাদের এই পরিবর্তনের যাত্রাপথের সাথে পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা।[1]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ অবিভক্ত বাংলার মানুষের মধ্যে এক ভীতি ও নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে শুরু হয় ব্যাপক বাস্তুত্যাগ ও সুরক্ষার খোঁজে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে অভিপ্রয়ান।[2] কিন্তু একথাও বলা একেবারে ঠিক হবে না যে তাঁরা তাড়িত হয়েছিলেন। বিভাজনের প্রথম দিকের সময় জুড়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা

[1] Abhijit Dasgupta, Displacement and Exil, *The State-Refugee Relasions in India*, UK: Oxford University Press, p. 23.
[2] Joya Chatterjee, Right or Charity? The Debate over Relife and Rehabilitation in West Bengal, 1947-50 in Suvir Kaul (ed), *The Partition of Memory: The After Life of the Division of India*, Delhi: Permanent Block, 2001, P.84.

কিন্তু নিজেদের ইচ্ছেতেই এসেছিলেন। তাড়িয়ে দেওয়ার মতন পরিস্থিতি কিন্তু তখনও তৈরি হয় নি। নিম্নে কতগুলি কারণ সুনির্দিষ্ট করা হল -

- পূর্ববঙ্গে যে ধরণের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সুযোগ-সুবিধা উচ্চবিত্তরা দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে এসেছিলেন, সেই একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য সমাজের নীচু তলার মানুষরাও আগের তুলনায় অনেক বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, যেটা আগে দেখা যায় নি।
- দীর্ঘদিন ধরে যে সামাজিক সম্মান বা সুযোগ-সুবিধা উচ্চবিত্তরা পেয়ে এসেছিলেন, তাতে ভাগ বসাতে শুরু করে সমাজের নীচু তলার মানুষ। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে গোটা সমাজে সমানাধিকারের দাবি উঠতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই একটা অস্তিত্বের সংকট নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয় বিশেষ করে হিন্দুদের ক্ষেত্রে।[3]
- সমাজের প্রভাবশালী বা ধনী সম্প্রদায়, যেমন- জমিদার, জোতদার, নায়েবশ্রেণি এরা ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে একটা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। একদিকে অর্থসংকট অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালন করে আসা আভিজাত্যকে বজায় রাখার তীব্র আকাঙ্খা এবং তার সাথে সাথে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা দেশত্যাগের পথকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিল।[4]
- এসবের পাশাপাশি, দেশবিভাজনের পরবর্তী ধাপে ইজ্জত, সম্মান রক্ষা করার তাগিদ, সর্বোপরি প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ এবং ভয় থেকেই বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেন। পারস্পারিক বিশ্বাসভঙ্গের একটা জায়গা নির্মিত হয়। সমস্যা দেখা যায় নিশ্চয়তার ক্ষেত্রেও। এই আলোচনায় ইতিহাস, সাহিত্য ও স্মৃতির এক মিশ্রিত গাথার মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু অভিবাসনের বাস্তব উপলব্ধি করা হয়েছে।

১.১ উদ্বাস্তু আগমনের ধারা

উদ্বাস্তু শব্দটির অর্থ 'ভিটেছাড়া'। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভিটে ছাড়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। মানুষ যখন মনে করে সে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপন্ন, তখনই সে বাস্তুত্যাগ করে। বাস্তুহারা এই মানুষই তখন 'উদ্বাস্তু' বা 'রিফিউজি' নামে নামাঙ্কিত হয়।[5] 'রিফিউজি' শব্দটির দুটি প্রতিশব্দ

[3] Ibid; p.89.
[4] Ibid; p.91.
[5] Meghna Guha Thakurata, "Families, Displacement, Partition", *in Reugee Watch,* September 1999, p.2.

রয়েছে; প্রথমত শরণার্থী। আক্ষরিক অর্থে, কোন ব্যক্তি যদি উর্ধতন শক্তির শরণ নেন অর্থাৎ আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। আর দ্বিতীয়টি হল 'উদ্বাস্তু'। যার অর্থ গৃহহীন। স্থানান্তর বা মাইগ্রেশানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে থাকে কয়কটি বিষয়, 'উদ্বাস্তু', 'অনুপ্রবেশকারী', 'প্রবাসী', 'যাযাবর প্রবণতা', 'উচ্ছেদ', 'পুনর্বাসন', 'অভিবাসন', ইত্যাদি।[6] ফলত, স্থানান্তর বলতে কী বোঝায় সে প্রসঙ্গে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে বাঁধাধরা সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে একথা আমরা বলতেই পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানান্তর বলতে 'উদ্বাস্তু' ও 'দেশভাগকে' অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানান্তর একটি বৃহৎ প্রক্রিয়া যার মধ্যে একটি কারণ হল দেশভাগ এবং এই দেশভাগের কারণে দেশত্যাগ। বলাবাহুল্য পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগকে সময়ের নিরিখে প্রধাণত দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে -

- স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের দেশত্যাগ
- স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের দেশত্যাগ

স্বাধীনতার আগে যারা দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের সঙ্গে স্বাধীনতার সমকালে অভিবাসিত হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য যেমন ছিল, একইভাবে আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যারা দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যেও কিন্তু শ্রেণীগত ও সামাজিক পরিচয়ের ভিন্নতা ছিল।[7]

১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের ঘটনাটিকে চারটি পৃথক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের কিছু পৃথক সত্তা রয়েছে -

- ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মুসলিম উদ্বাস্তুদের গমন
- পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখ দের পূর্ব পাঞ্জাব তথা ভারতে আগমন
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে গমন
- পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে আগমন।[8]

বিভাজনের ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যেমন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নানান জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছিল, একইভাবে মুসলমানরাও পূর্ববঙ্গে যায়। কিন্তু তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে ভারত থেকে ৭০ লক্ষ শরণার্থী গিয়েছিল, এর

[6] Ibid, P 4
[7] Government of West Bengal Report, Relief and Rehabilitation Committee Report, 1981-82, Calcutta, Sree Saraswati Press Limited, 1982, p. 45
[8] Ibid, p. 46-47

মধ্যে ৬৩ লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, আর পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল প্রায় ৭ লক্ষ। অন্যদিকে, ১৯৫৬ এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এই ৭ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষই ভারতে ফিরে এসেছিল। উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন- পশ্চিম ভারতে ও পূর্ব ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা কিংবা তার চরিত্র ছিল অনেকটাই ভিন্ন। এর সাথে সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক- উদ্বাস্তু অভিবাসনের একেবারে প্রথম পর্যায় ১৯৪৭-৪৮-এ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের এবং শিক্ষিত শ্রেণির।[9] দেশত্যাগ করে, নিজেদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অভিবাসিত হলেও, এঁরা নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমার্জিত মননশীল পুঁজি- যা তাঁদের উদ্বাস্তু জীবনপটে সহায়ক হয়েছে।

ঠিক এর বিপরীত দিকে ছিল ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু। এঁরা ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মূলত নিম্ন বর্ণের কৃষিজীবী পুঁজিহীন দরিদ্র মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সরকারি ক্যাম্পে।[10] উদ্বাস্তু জীবনে এঁদের জীবন যুদ্ধ, লড়াই সমস্ত কিছুই উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির উদ্বাস্তুদের থেকে অনেকটাই পৃথক ছিল।[11] এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে যে, এই নিম্ন শ্রেণির উদ্বাস্তুরা কেন অভিবাসনের প্রথম পর্যায়ে দেশত্যাগ করেননি? কেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন? যেই চাওয়াটা প্রথম পর্যায়ে অভিবাসিত হয়ে আসা উচ্চবর্ণের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। কেন এই ভিন্নতা নির্মিত হয়েছিল তা আলোচিত হওয়া প্রাসঙ্গিক।[12] এই বিষয়ে, পরে আলোচনা করা হবে।

গান্ধীসহ তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমূহের ধারণা হয়েছিল যে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগ করবেন। স্বদেশে টিকে থাকা কোনোভাবেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। তাই এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের মূল দায়িত্ব হবে এই সকল উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করা এবং তাঁদের জন্য সকল প্রকারের যথাযথ ব্যবস্থা করা কিংবা সুবিধা প্রদান। কিন্তু এমন প্রতিশ্রুতি কি আদৌ কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল? নাকি তৎকালীন সরকার পক্ষের কথায় ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা গিয়েছিল? শুধু তাই

---

[9] Ibid, p. 87.
[10] Ibid., pp. 88-89.
[11] Ibid., p. 90.
[12] Gynendra Pandey, *Remembering Partition, Violence, Nationalism and History of India*, New York: Cambridge University Press, 2001, p. 45-46.

নয়, তৎকালীন নেহেরু সরকার উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে একটি নীতি গ্রহণ করেন যেখানে বলা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা নতুন করে দেশত্যাগ করে আসবেন তাঁদের পুনর্বাসন প্রদান করা হবে না। তাঁরা শুধুমাত্র সাময়িক আশ্রয় পাবেন।[13] যেকোনো উপায়ে উদ্বাস্তু আগমনের স্রোতকে শক্তভাবে আটকানোই ছিল তৎকালীন সরকারের মূল চিন্তাধারা।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ আলোচনাতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, মূল সমস্যা ছিল চিন্তাভাবনায়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার উভয় পক্ষই দেশবিভাজন এবং উদ্বাস্তু অভিবাসনের বিষয়টিকে একটা সাময়িক বিষয়রূপে ভেবেছিলেন। পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হলে সকলে নিজের নিজের দেশে এবং ভিটেতে ফিরে যাবেন এটাই ধারণা ছিল।[14] কিন্তু বাস্তবে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটে যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অপমান, নির্যাতনের থেকে নিজ সম্মান এবং সর্বোপরি জীবন বাঁচাতে মানুষ একদিকে যেমন দেশান্তরিত হয়েছেন আবার অনেক সময় বাধ্য হয়েই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষজন এই এত নতুনত্বের সাথে কীভাবে মানিয়ে চলবে তা উদ্বাস্তু মানুষের মননপটে এক আত্মিক সংকট নির্মাণ করেছিল। এই নির্মাণের গভীরেই নিহিত ছিল মূল দুটি সমস্যা একদিকে দেশান্তরী হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হতে হয়েছিল আবার অন্যদিকে যে নতুন দেশে যেতে হল সেই দেশটাকে ভালোবাসতে চেয়েও ভালোবাসতে না পারার এক মিলিত বেদনা, দ্বন্দ উদ্বাস্তু জীবনকে হতাশাময় করে তুলেছিল। কিন্তু তারপরেও থেমে থাকেনি তাঁদের লড়াই, তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রয়াস। এই সংকটকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে উদ্বাস্তু অভিবাসন কী অথবা কীভাবে এই অভিবাসনের প্রেক্ষাপট নির্মাণ হয়েছিল সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ দেশভাগজনিত উদ্বাস্তুদের শ্রেণিবিভাগ

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত মানুষদেরকে কী নামে নামাঙ্কিত করা হবে তা নিয়ে একাধিকবার নানান মত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এক্ষেত্রে একটা নতুন মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে 'উদ্বাস্তু' হল তাঁরাই যাঁরা বড় আকারের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে বিস্থাপিত হয়েছেন। তবে

[13] Ibid., p. 49.
[14] Ibid., p. 51.

কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েই যে পূর্ববাংলার মানুষেরা পশ্চিমবাংলায় অভিবাসিত হয়েছিলেন, তা নয়। এটি অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের তাগিদে একজন উদ্বাস্তু ও একজন বিস্থাপিত ব্যক্তিকে আলাদা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই পরিচয়পত্রের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তুদের চিহ্নিতকরণের একটা পদক্ষেপ নেওয়া হল।

উদ্বাস্তুদের প্রামাণিক পরিচয়পত্র হিসেবে নিম্নলিখিত নথিগুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয় -

- যাঁরা ১৯৫১ এর মার্চের মধ্যে এসেছেন, তাঁদের জন্য ১৯৫১ এর আদমশুমারির খতিয়ানগুলি গ্রাহ্য হয়। ওই জনগণনার সময়ে তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের উদ্বাস্তু বলে ঘোষণা করেছিলেন।
- যাঁরা ১৯৫১ এর মার্চ থেকে ১৯৫২ এর অক্টোবরের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের জন্য সীমান্তে দেওয়া কাগজই প্রমাণপত্র বলে স্বীকৃত হয়।
- যাঁরা এরপর অর্থাৎ ১৯৫৪ এর শেষ অবধি এসেছিলেন তাঁদের জন্য অভিবাসন শংসাপত্রের নথি প্রামাণিক বলে বিবেচ্য হয়। এই অভিবাসন শংসাপত্র প্রদান করার পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল 'নাগরিক'দের থেকে 'অনাগরিক'দের কিংবা 'অভিবাসী'দের আলাদা করা।[15]

পরবর্তী সময়ে এই মানুষগুলিকে নতুন নতুন নামে চিহ্নিত করা হয় -

- ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে যাঁরা আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন তাঁদের বল হল - 'নয়া অভিবাসী'।
- যাঁরা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮এর মধ্যে এখানে এসেছিলেন তাঁরা হলেন 'পুরোনো অভিবাসী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নয়া অভিবাসী'দের থেকে 'পুরোনো অভিবাসী'দের আলাদা করতে গিয়ে, সরকার এমন অনেককেই বাদ দিয়ে দিয়েছিল যাঁরা ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ এর মধ্যে এদেশে এসেছিলেন।[16]

দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু অভিধাটিকে আবার নিছক আক্ষরিক অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষ আক্রমণ অথবা উৎপীড়নের কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আবার যাঁরা

[15] Ibib., p. 43.
[16] Ibid., p. 45.

স্বেচ্ছায় ভারতের নাগরিকত্ব বেছে নিয়েছেন, তাঁরাও এই অভিধার অন্তর্গত। তাঁরা কোন সময়ে ভারতে এসেছেন সেটা বিবেচ্য নয়।

ভারত সরকার ইচ্ছাকৃত বা খুব সচেতনভাবে 'উদ্বাস্তু' অভিধাটিকে এড়িয়ে গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, যাতে এর কোনো রাজনৈতিক ও আইনি তাৎপর্য না থাকে। এইরূপ অজস্র সরকারি অভিধার কথা বলা হলেও, উদ্বাস্তুরা কিন্তু নিজেদের 'বাস্তুহারা' বলেই অভিহিত করতেন। বাস্তুহারা বা শরণার্থী অভিধা ব্যবহার করে উদ্বাস্তুরা এটাই বোঝাবার চেষ্টা করতেন, যে তাঁরা বাইরে থেকে আসা আশ্রয়প্রার্থী নন। বরং তাঁরা হল ভারতেরই 'নয়া নাগরিক', যাঁরা একটি নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় ঘর হারিয়েছেন। 'নিষ্ক্রান্ত', 'বিস্থাপিত', 'উদ্বাস্তু' কিংবা 'অভিবাসী' এই সকল অভিধায় বারংবার তাঁরা বিরোধিতা করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে এই সকল অভিধাগুলি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে 'নাগরিক'দের থেকে পৃথক করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সারণি – ২.১: জনগণনার ভিত্তিতে বাস্তুহারা মানুষের জনবিন্যাস।

ক্রমিক সংখ্যা	বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তু শতাংশ
১.	১৯৫১	২৬২৯৯৯৮০	২১০৪২০৪১	৮
২.	১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮
৩.	১৯৭১	৪৪১২০১১৩	৪২৯৩০০০	৯.৮৬

সূত্র: উদ্বাস্তু: ইতিহাসে ও আখ্যানে, আশীস হীরা, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ৬৩।

১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে নীচের সারণিতে দেখানো হল নাগরিক উদ্বাস্তু কোন ধাপে কেমন বেড়েছে[17] সরকারি নথি এবং সরকারি রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায়, দেশ বিভাজন

[17] শিবাজী প্রতিম বসু, *ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস্ সন্ধানে,* সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* গাঙচিল, ২০০৮, পৃ ৭৯।

ক্রমিক সংখ্যা	বছর	পশ্চিমবঙ্গে মোট শহরের জনসংখ্যা	উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গে, মোট জনসংখ্যার -তুলনায় শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যার শতকরা হার
১.	১৯৫১	৬২৮১৬৪২	১০৫২১২১	১৬.৭৪
২.	১৯৬১	৮৫৪০৮৪২	১৫৬১৫৩০	১৮.২৮
৩.	১৯৭১	১০৯৬৭০৩৩	২৭২৪৯৩৬	২৪.৮৪

সূত্র: শিবাজী প্রতিম বসু, *ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস্ সন্ধানে,* সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশভাগ, স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* গাঙচিল, ২০০৮, পৃ. ৭৯।

এবং উদ্বাস্তু অভিবাসনের সময়ে যে সংখ্যায় হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, সে তুলনায় পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের সংখ্যা অনেকটাই কম।[18] কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন ধারবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৫২ সালের সময়কালেও। বিশেষ করে ১৯৫২ এর শুরুর দিকেই পশ্চিম বাংলায় আশ্রয়প্রার্থি বিস্থাপিত মানুষদের সংখ্যা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রথমাবস্থায় প্রতিমাসে কত জন করে উদ্বাস্তুর সমাগম হয়েছে সে বিষয়ে পুঙ্খানিপুঙ্খভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হত এবং একইসাথে তা যথা সময়ে- সরকারি প্রতিবেদনে প্রদান করা হত। এর থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের আগমনের একটা হিসেব রাখা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যবর্তীকালীন সময়কালে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা একধাপে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়।[19]

বিভিন্ন সময়ে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে যা এই আলোচনাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশভাগের সময় থেকে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু যে বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন ধরণের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য

[18] Government of West Bengal Report, Relief and Rehabilitation Committee Report, 1981-82, Calcutta, Sree Saraswati Press Limited, 1982, p. 58.
[19] Ibid., p. 60.

করা যায় যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশের মানুষ তুলনামূলক ভাবে কম দুঃখ-দুর্দশা ও জীবন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

উদ্বাস্তু হিসেবে দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা ভোগ করার নিরিখে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে -

- সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তু
- চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তু। এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[20]

১.৩ সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তুদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনায় যাঁরা তুলনামূলকভাবে কম দুঃখভোগ করেছেন তাঁদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় -

- এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা শিক্ষিত ছিলেন। অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল হিন্দুদের সংখ্যা ছিল বহুল।
- এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গে বসবাসকালে, সমাজ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশি সচেতন ছিলেন। তাই নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ১৯৪৬ সালে ব্যাপক হিন্দু নিধনের ঘটনা ঘটার অব্যবহিতর পরে তাঁরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে কলকাতায় চলে আসার চেষ্টা করেন। তবে, এই সময়ে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।
- এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা সমাজ পরিস্থিতি নিয়ে সচেতন থাকায় তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার অর্থ হল পাকিস্তান মূলত মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মের নিরাপত্তা রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না বলে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।
- ভারত ও পাকিস্তান বিভাজিত হওয়ার পর সরকারি চাকুরীজীবীদের এক নির্দেশের মাধ্যমে সরকার জানিয়ে দিয়েছিল যে, চাকুরীজীবীদের মধ্যে কে ভারতে থাকবে এবং

[20] Ibid., p. 59.

কে পাকিস্তনে যাবে তা 'অপশন' দিয়ে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকার কে জানিয়ে দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বর্ণহিন্দু সরকারি চাকুরীজীবীরা 'অপশন' দিয়ে চাকুরী নিয়ে ভারতে চলে আসেন। দেশভাগের পর থেকেই এই শ্রেণির অন্যান্য উদ্বাস্তুরা তাঁদের পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যেই তাঁদের অধিকাংশ এপার বাংলায় চলে আসেন।

- এঁরা উচ্চ ও মধ্য বর্ণের হিন্দু এবং এঁরা মূলত ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরগুলিতে বসবাস করতেন।
- এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা দেশত্যাগ করে এপার বাংলায় এসেও সাধারণভাবে শহরগুলিতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা সহ মফস্বল জেলাগুলির বিভিন্ন শহরে বা রেল যোগাযোগ আছে এমন স্থানে তারা সাধারণভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁদের বসতির পরিমাণ ছিল অনেক কম।
- এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা অধিকাংশই পূর্ববঙ্গে ধনী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সরকারি চাকুরে, ডাক্তার, শিক্ষক, স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ছিলেন অনেকেই। অনেকের প্রচুর কৃষিজমি ছিল। কেউ কেউ ছিলেন জমিদার। নিজের এলাকায় তাঁরাই ছিলেন মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রভু। আর্থিক দিক থেকে তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সু স্থানে ।
- এই ধারার উদ্বাস্তুরাই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের এলাকায় প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হন। শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে তাঁরা যথেষ্ট উন্নতি করতে সক্ষম হন। তাঁদের পরিবারের সন্তানেরা পরবর্তী সময়ে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।[21]

১.৪ চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তুদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

[21] সরসিজ সেনগুপ্ত, *বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিগন্ত,* কলকাতা: সোম পাবলিশিং, ২০২০, পৃ. ৫৬।

সীমিত ভাগ্য বিপর্যয়ভোগী উদ্বাস্তুরা ছাড়াও পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত ও আশ্রয় গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের অপর একটি ধারা লক্ষ্য করা যায় যাঁদের উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী মর্মান্তিক। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের মধ্যেও বিভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল -

- উদ্বাস্তু জীবনে যে সকল মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণ ও দাঙ্গার ফলে সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার শিকার হয়েছেন। তাঁরা পূর্ববঙ্গের সমাজ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে কম সচেতন ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মাটির যোগ ছিল খুব গভীর।[22] তাই তাঁরা কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁদের সাত পুরুষের জন্মভূমি ত্যাগ করার কথা চিন্তা করেননি। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালি বা ত্রিপুরায় ভয়ানক হিন্দু নিধনের পর বা ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পরও তারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের পথে পা বাড়াননি।
- এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু। এঁদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। তাছাড়া অন্যান্য পিছিয়ে পড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের দরিদ্র কৃষক, মজুর প্রভৃতি মানুষ এই দলে ছিলেন। এঁরা মূলত শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাস করতেন।[23] এপার বাংলায় এসেও তাঁদের অধিকাংশই আশ্রয় নিয়েছিলেন বিভিন্ন গ্রামে। তাঁরা মূলত গ্রামের কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিছু মানুষ গৃহনির্মান, তাঁত বোনা, ছোটখাটো দোকান চালানো, মালপত্র ফেরি করা, রিক্সা চালানো প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। গ্রামীন অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই তাঁরা এই সকল পেশার প্রসার ঘটিয়েছিল। তবে দরিদ্র এই উদ্বাস্তুরা স্থানীয় মানুষজনের দ্বারা অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হয়েছিলেন।
- দেশভাগ ও তাঁদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনায় এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুরা হতাশ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পরে তাঁরা মানসিকভাবে এই পরিস্থিতি মেনে নেন। পূর্ববঙ্গেই তাঁরা মুসলিমদের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারবে বলে আশা করেছিলেন। এই শ্রেণীর সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রথমদিকে কখনোই ভাবতে পারেননি যে, পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শীঘ্রই নষ্ট হতে পারে এবং

[22] তদেব, পৃ. ৬৭।

[23] তদেব, পৃ. ৬৯।

তাঁদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম কিছুকাল পরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা দারুণভাবে আক্রান্ত ও বিপন্ন হতে পারে।[24]

- এঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। পূর্ববঙ্গ শহর থেকে বহু দূরবর্তী গ্রামে বসবাসকারীদের পক্ষে, গ্রামের সীমানা পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল দুরাশা । তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন।

উপরিউক্ত চেনা বা পরিচিত ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে একটা নতুন শ্রেণীর উদ্বাস্তুর কথাও জানা যায়। এঁদেরকে বলা হয়েছে- 'নতুন ধারার উদ্বাস্তু'। এঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের চেষ্টায় ও নিজ উদ্যোগে পারিবারিক সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশত্যাগ করেছিলেন। অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মতন সমস্যা বা বিপর্যয়ের সন্মুখীন এদেরকে হতে হয়নি- উদ্বাস্তু অভিবাসনে সম্পূর্ণ নিজ বুদ্ধি, চেষ্টা ও সচেতনতার পরিচয় বহন করেছিল এই 'নতুন ধারার উদ্বাস্তু'রা।[25] মূল যে বিষয়টি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা হল নিজেদের পারিবারিক সম্পত্তি বিনিময় করে দেশত্যাগ। এঁরা নিজেদের সম্পত্তি বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন অভিবাসনের পূর্বে। তাই পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছিয়ে, কোথায় যাবেন বা কোথায় গিয়ে আশ্রয়স্থল পাবেন তা নিয়ে তাঁদেরকে ভাবতে হয়নি। সাধারণভাবে বিনিময়ের সময়ে একটি পরিবারের সাথে আর একটি পরিবারের স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় হতো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি পরিবারের সঙ্গে ততোধিক পরিবারের মধ্যেও বিনিময় হয়েছিল।

উল্লেখ্য, উত্তাল সামাজিক ও রাজনৈতিক সময়কালে, জমি বিক্রীর খরিদ্দারের খোঁজ করা ছিল একটি জটিল কাজ। এই জটিলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই জমি বিনিময় বা সম্পত্তি বিনিময়ের মতন বিষয় কে কার্যকারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নিজ সম্পত্তি বা জমি বিক্রি করে, নতুন জায়গায় আবার জমি কেনার প্রক্রিয়া তৎকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠিন ছিল। অন্যদিকে দেশত্যাগের সময়ে, নগদ অর্থ নিয়ে যাতায়াত করাও ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন কাজ।[26] তাই বিনিময়ের প্রতি অধিক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যে মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে ছিল সে যদি দেশত্যাগ করে

[24] Arie M. Dubnov & Laura Robson (ed), *Partitions: A Transnational History of Twentieth- Century Territorial Separation*, Stanford: Stanord Uniersity Press, 2019, p. 89.
[25] Ibid., p. 91.
[26] Saroj Chakraborty, With Dr. B.C Roy and Other Chief Ministers*: A Record upto 1962*, Calcutta: Bensons, 1974, p.106.

তাহলে তার সম্পত্তি একজন হিন্দু উদ্বাস্তু কিনে নেবেন । এইভাবে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক বিনিময় প্রথা গড়ে উঠেছিল।

বিনিময় ব্যবস্থা ১৯৬০ এর সময়কালেও টিকেছিল। প্রধানত, সীমানাবর্তী অঞ্চল যেমন ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ অঞ্চলে যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান দুপক্ষেরই মিশ্রিত বসতি ছিল তাই সর্বাপেক্ষা অধিক বিনিময় ব্যবস্থা এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটা পারস্পারিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এই বিনিময় ব্যবস্থা মূলত নির্ধারিত হতো পছন্দ ও প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে। তবে গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যেকার বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের এক বিঘা জমির পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে এক বিঘা জমি। কিন্তু সমস্যা তৈরী হয়েছিল প্রধাণত শহরকেন্দ্রিক বিনিময় ব্যবস্থাতে।[27] কারণ কলকাতা শহরের আঞ্চলিক গুরুত্ব গ্রামাঞ্চলের থেকে অনেকবেশী ছিল। তাই এক্ষেত্রে এর পরিমাপ সমানুপাতিক ছিল না। বিনিময় ব্যবস্থাতে যাতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হয় তারজন্যে আঞ্চলিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ব্যক্তি দুপক্ষের মধ্যে রাখা হতো। এই ধরণের বিনিময় ব্যবস্থা দুই বাংলার উদ্বাস্তুরা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতেন। তাই সেই ক্ষেত্রে এই ধরণের বিনিময় সম্পতির কোনো সুনির্দিষ্ট হিসেব সরকারি নথিতে নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে সকল উদ্বাস্তুরা এই বিনিময় ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন –তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও সম্পন্ন। অন্যান্য উদ্বাস্তুদের সাথে তাঁদের পার্থক্য এখানেই। সেই কারণে এই শ্রেণীর কোনো উদ্বাস্তুদেরকেই ক্যাম্প বা কলোনিতে জায়গা পাওয়ার কথা ভাবতেই হয়নি। অনেক বেশী নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করেছিলেন এই ‘নতুন ধারার উদ্বাস্তু’রা।

ইতিহাসে যেমন এর উল্লেখ রয়েছে তেমনই সাহিত্যের ভান্ডারেও এই বিনিময় ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ ‘পরতাল’ উপন্যাসের কাশিনাথ দাসের কথা বলা যেতে পারে। সে দেশত্যাগ করেছিল উদ্বাস্তু অভিবাসনের প্রথমার্ধে। একজন মুসলমানের সাথে তার সম্পত্তি বিনিময় করেছিল এবং ঐ মুসলমান পরিবারটি দৌলতপুরে কাশীনাথের বাড়ির দখল পেয়েছিল। শচীন দাশের ‘মানচিত্র বদলে যায়’[28] উপন্যাসও আরেকটি উদাহরণ যেখানে দুটি পরিবারের মধ্যেকার বিনিময় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। একদিকে, মহীকান্ত গুপ্ত – দক্ষিণ

[27] Ibid., p.111.
[28] তদেব, পৃ. ৭০।

কলকাতার জবরদখল কলোনির একজন নেতা পূর্ববঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী ললিতবাবুর পরিবার তাঁদের সম্পত্তি বিনিময় করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন, অন্যদিকে মাদারিপুরের সম্পত্তির সঙ্গে পার্ক সার্কাসের কামরুদ্দিনের সম্পত্তির বিনিময় হয়। এই বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কলকাতার এক বৃহৎ বাড়ির মালিকানা পান ললিতবাবু। এই বিশেষ শ্রেণীর উদ্বাস্তুরা তৎকালীন জটিল পরিস্থিতিতেও একদিকে যেমন অনেকবেশী সমৃদ্ধশালী ছিলেন, আবার একইসাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলেও অন্যান্যের অপেক্ষায় অনেকবেশী এগিয়ে ছিলেন।

১.৫ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে সরকারি পদক্ষেপ

অভিবাসনের পর সরকার এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গে তা নিয়েই আলোচ্য অধ্যায়ের এই দ্বিতীয় অংশটি নির্মাণের চেষ্টা করেছি।

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে অন্যান্য অনেক গুলি সমস্যার মতনই অভিবাসনও এমন একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যাকে কেন্দ্র করে কোনো সঠিক ও সম্যক সমাধানসূত্র নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করা সম্ভব ছিল না।

উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে ছিল 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর' (Refugee Relief and Rehabilitation /RRR Department)। (ক) এই দপ্তর কখন, কিভাবে নির্মিত হয়েছে, (খ) এর গঠনশৈলী (Structure of RRR Department), (গ) কারা এই দপ্তরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, (ঘ) কিভাবে এই দপ্তর উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে কাজ করেছে, (ঙ) তাদের কাজের ধরণ, (চ) তাদের কাজের সফলতা কিংবা বিফলতা এই সমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রসঙ্গে এর আগে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

'A Hand book of Refugee Rehabilitation' নির্মিত হয়, যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়- ১৯৫৩ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর।[29] এই বিভাগের বা দপ্তরের সেক্রেটারি ছিলেন এইচ ব্যানার্জী। তিনি পরবর্তী সময়ে এর নাম দেন, 'A Manual of Instructions for the Guidance

[29] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p. 67.

of Officers of the Refugee Relief and Rehabilitation Department'। অর্থাৎ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কর্মীদের জন্য একটা গাইড বা নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয় - জেলা অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, যাতে তারা এই উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজ করতে পারে।

১৯৫৪ সালের, ১ লা নভেম্বর পার্ট ওয়ান রূপে একটা হ্যান্ডবুক প্রকাশ করা হয়, এইচ ব্যানার্জির স্বাক্ষর সম্বলিত। এখানে তাঁকে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারি রূপেই সম্বোধন করা হয়। কান্তি বিশ্বাস রাজ্যসরকারের দুটি নির্দিষ্ট পদে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে, আর আর আর দপ্তরের মিনিস্টার ইন চার্জ ছিলেন কান্তি বিশ্বাস।[30] ঐ একই সময়ে তিনি রাজ্যসরকারের আরো দুটি পদে বহাল ছিলেন। (১) শিক্ষা দপ্তরের প্রথমিক, সেকেন্ডারি ও মাদ্রাসার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী, (২) উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি একটি উদ্বাস্তু বিষয়ে ম্যানুয়াল নির্মাণ করেন। তাঁর একটি বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক- 'The Publication of a manual for efficient and smooth functioning of the department of R R R is important'- অর্থাৎ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজ সহজ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে একটি যথাযথ ও উপযুক্ত ম্যানুয়াল প্রয়োজন।[31]

এই দপ্তরের কাজ এমন মানুষদের কে নিয়ে ছিল যাঁরা দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের বাসভূমি থেকে উত্থাপিত। প্রশ্ন ছিল সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের যাঁরা নিজেদের দেশ বাসভূমি ত্যাগ করে সর্বহারা হয়েছিলেন। তাই এই দপ্তরের কাজ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অন্যান্য বিষয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা ও পৃথক।

১৯৯৮ এর দশকে প্রদীপ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি এবং একইসাথে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কমিশনার পদে বহাল হন। ১৯৯৮ এর ২২শে জানুয়ারি, সরকারপক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত সার্কুলার নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে একটি দল বা টিম সংগঠিত করা হয় বেশ কিছু দক্ষ কর্মীদের কে সঙ্গে নিয়ে যাদের উদ্দেশ্য ছিল রিভিউড ম্যানুয়াল হ্যান্ডবুক তৈরি করা। এই দলের সদস্যরা ছিলেন সাধন ঘোষ, শুভাংশু কুমার বোস, আশীষ প্রামাণিক, তারক নাথ দে, শর্বরী চক্রবর্তী-

[30] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p. 20.
[31] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p. 23.

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে একটি উপযুক্ত সংশোধিত ম্যানুয়াল হ্যান্ডবুক নির্মাণে এদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[32]

সরকার থেকে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত দুধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়। (ক) এইচ বি লোন: এ ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে প্লট প্রদানের সুযোগ- সুবিধা দেওয়া হয় এবং (খ) এস টি লোন: এক্ষেত্রে প্লট প্রদান করা হয়নি। কিন্তু নিজেরা যাতে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্য লোন প্রদান থেকে শুরু করে একটা ভালো অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই লোন গ্রহণকারী পরিবারগুলিকে কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিংবা তাঁরা কোথায় প্লট পাবেন তা সরকারের বিবেচনাধীন প্রসঙ্গ ছিল না। তবে, প্রাসঙ্গিকভাবে দুই ক্ষেত্রেই এই উদ্বাস্তুদের তিন মাসের জন্য 'মেন্টেনেন্স গ্রান্ট' দেওয়া হয়।

পুনর্বাসন বিভাগের সরকারি পদস্থ কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন- সাপ্লাই ও এক্যাউন্ট দপ্তরে একজন ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর। পুনর্বাসন কাজের জন্য- একজন পৃথক ডিরেক্টর, একজন ডেপুটি ডিরেক্টর, জেলা কতৃপক্ষ। সমস্ত কাজের একেবারে শীর্ষে আর আর আর দপ্তর।

১.৬ ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে সরকারি নীতির পর্যালোচনা

প্রথমত, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আশা করেছিলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুরা আবার তাদের নিজের দেশে ফিরে যাবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিলেন যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। সাময়িকভাবে তাঁরা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় পাবেন।[33] তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাকসেনা কলকাতায় এক বৈঠকে রাজ্য সরকার কে সীমান্তবর্তী উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন আশ্রয় শিবির তৈরির নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় একাধিক উদ্বাস্তু শিবির গড়ে ওঠে।[34]

---

[32] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation o Refugees, p. 23.

[33] Yasmin Khan, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, New Haven and London: Yale University Press, 2007, p. 90.

[34] Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal.

দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকেই সরকার পক্ষ এবং সাধারণ মানুষ উভয়পক্ষের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারা পরিবারগুলি আর ফিরে যাবেনা। বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন একটি স্থায়ী বিষয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ তে, ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাস্তুহারাদের 'Migration Certificate' দেওয়ার প্রথা চালু করে। একই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণকার্যের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কথাও চিন্তা করে।

তৃতীয়ত, কলোনি নির্মাণের প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে সরকার তার নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু কলোনি এবং জবরদখল কলোনিগুলিকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখেছে এবং কলোনির উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রথমদিকে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলির উন্নয়নে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকলেও, পরবর্তীকালে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। সরকার প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলির সঙ্গে সঙ্গে জবরদখল কলোনিগুলির উন্নয়নেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে, Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal-এ লেখা হয়েছে যে, 'The Working Group feels that time has now come when there should be no distinction between the squatters colonies set up by 1950 and those set up upto 16th December ,1971 in the matter of regularization of the colonies and their development.'[35]

চতুর্থত, উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণকারী এমন অনেক মহিলা ও শিশু ছিল যাদের দেখাশোনার জন্য পরিবারে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ছিল না। তারা সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে পরিবার পরিচালনা করতেও সক্ষম ছিল না। তাই সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা পুনর্বাসন পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে, এমন পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সরকারের উদ্যোগে তাদের দীর্ঘকাল ধরে উদ্বাস্তু শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরগুলি 'Permanent Liability Camp' বা 'P.L.Camp' নামে পরিচিতি লাভ করে।[36]

১.৭ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ত্রাণ ব্যবস্থা

[35] Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal.
[36] Rehabilitation of Refugees a Statiscal Survey 1955/VIII 13-2.

১৯৪৭ সালের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলী এবং ২৪ পরগণা জেলা অথবা পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে আশ্রয় নিলে, সরকারের সামনে এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণের বিষয়টি সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় । নিজেস্ব বাস্তুভিটা হারিয়ে এই সকল উদ্বাস্তুরা নিঃস্ব, সর্বহারা ও বিধ্বস্ত হয়ে এপার বাংলার এসেছিলেন। এখানকার পাটের গুদামে, সরকারি বিল্ডিং এর ছাদের তলায়, পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদের নীচে, রাস্তার পাশে ফুটপাতে, আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া যেমন প্রয়োজন ছিল, তার সাথে সাথে তাঁদের জন্য খাবার, ঔষধ ,বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন ছিল।

পুনর্বাসন লাভের আগে তাঁরা যাতে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র পান সে উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু উদ্বাস্তু শিবির তৈরি করেছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র ২৫% উদ্বাস্তুরা সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়গ্রহণকারী ৩১.৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ৭.৯২ লক্ষ উদ্বাস্তু সরকারী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় ৭৫ শতাংশ উদ্বাস্তুই সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেননি।[37] শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা সাময়িককালের জন্য তাঁদের বন্ধু, আত্মীয়দের পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সকল আত্মীয় বা বন্ধুরা ইতিপূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে এসে বসতি গড়ে তুলেছিল। বন্ধু ও আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা বার্ধক্য বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে দীর্ঘদিন এইসব বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই জীবনের শেষদিনের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন।

পুনর্বাসন হোক কিংবা ত্রাণ প্রদানই হোক প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার বিভাজনের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে। তবে তৎকালীন সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত হয়ে আসা প্রতিটি উদ্বাস্তুকেই যে ‘বোঝা’ বা ‘বার্ডেন’ স্বরূপ দেখেছিল তা কিন্তু নয়। ১৯৫০ সালের আগে কিংবা ঐ সময়কালে যাঁরা এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে, তাঁরা মূলত ছিলেন ‘সম্পদ’ বা ‘এস্যেট’।[38] কারণ তাঁদের ছিল একটা শক্তিশালী সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানদন্ড। শুধু তাই নয়,

[37] Relief & Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, 1956, Government of West Bengal, VIII 13-3.
[38] A Handbook of Government Policy & Plan for the Resettlement of Refugees Population June, 1948 (2) VIII 013.

তাঁরা সরকারি পুনর্বাসন কিংবা ডোলের জন্য অপেক্ষা করেননি। নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে যাঁরা অভিবাসিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের কাছে তাঁরা ছিলেন, 'বোঝা' বা 'বার্ডেন' স্বরূপ।[39] তাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের একটি স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, এই সময়ে প্রতি হাজার উদ্বাস্তুর জন্য খরচ হয় প্রচুর, যার পরিমাণ ২ লক্ষ ৯০ হাজারেরও বেশি। তাই সরকার তাঁদের বিষয়ে কোনো তাগিদ বা উৎসাহ কিংবা সহানুভূতি দেখায় নি। তাঁদের পুনর্বাসন কিংবা ত্রাণ প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারের তেমন আগ্রহ বা সচেতনতা দেখা যায়নি। সরকারি ত্রাণ, পুনর্বাসন কিংবা কলোনি স্থাপনের কথা যখন বলা হবে, তখন এই দুই ধরণের উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গকে মাথায় রেখেই সমগ্র আলোচনা এগোতে হবে।

বানপুর, পেট্রাপোল, হাসনাবাদ এই সকল ট্রানজিট পয়েন্ট থেকে উদ্বাস্তুদের শিয়ালদহ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়, রেজিস্ট্রেশনের জন্যে। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছানোর পর, রেজিস্ট্রেশন টেবিলে উদ্বাস্তুদের সমস্ত কাগজপত্র, নথি ভালো করে পর্যবেক্ষন করা হত।[40] তাঁদের পরিচয় বা পরিচিতি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করা হতো এবং সব কিছুর শেষে তাঁদেরকে প্রদান করা হতো 'রেজিস্ট্রেশন কার্ড' এবং তারপর ট্রেনে করে কিংবা সড়কপথে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাঁদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। অতীতে কে কি কাজ করত বা কেমন পেশায় নিযুক্ত ছিল সে বিষয়ে জানা হয়নি। সকলকেই নমঃশূদ্র কৃষক নামে দাগিয়ে দেওয়া হয়।

মূলত তিন ধরণের কার্ড প্রদান করা হয়েছিল তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কে মাথায় রেখে। সেখানে বাস্তব যোগ্যতার বা জীবিকার গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। সাদা রঙের কার্ড তাঁদেরকে প্রদান করা হল এক্কেবারে সর্বহারা হয়ে যাঁরা এসেছিলেন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে থাকতে চাইলেও তাঁদেরকেই পাঠানো হল সরকার নির্মিত বিভিন্ন ক্যাম্পে।[41] এই ক্যাম্পগুলিতে কাজ করার মতন সুযোগ-সুবিধা উদ্বাস্তুদের ছিল না। তাই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে সরকারি ক্যাশ ডোলের উপর। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১২ টাকা বরাদ্দ করা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৮ টাকা এবং সামান্য কিছু রেশন। কোনোভাবেই এই সহায়তা তাঁদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। এই কারণে উদ্বাস্তুরা নিজ উদ্যোগে উপার্জনের চেষ্টা করেছিলেন। কেউ চায়ের দোকান, কেউ ছোটখাট

[39] Rehabilitation of Refugees a Statiscal Survey 1955, p. VIII &13-2.
[40] Roger Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, Journal of Refugees Studies 1991, p. 12-13.
[41] Ibiid., p.67.

ব্যবসা করেছেন, অন্যদিকে মহিলারা বিড়ি বাঁধার কাজ, খবরের কাগজের ঠোঙা বানানোর সাথে সাথে গোবর বিক্রি কিংবা বাড়ির কাজের লোকের পেশাতেও যুক্ত হয়েছিলেন। অধিকাংশ নমঃশূদ্ররাই পেয়েছিলেন এই 'সাদা কার্ড'। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদেরই জায়গা হল বিভিন্ন ক্যাম্প গুলিতে।[42] অন্য দিকে 'নীল রঙের কার্ড' দেওয়া হল তাঁদেরকে যাঁদের সাময়িক কিছু সাহায্যের প্রয়োজন থাকলেও তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অভিবাসনে সক্ষম ছিলেন। আর 'লাল কার্ড' প্রদান করা হল তাঁদেরকে যাঁদের সরকারি সাহায্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এঁরা নিজেরাই- নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম ছিলেন।

১.৮ উদ্বাস্তু শিবির প্রতিষ্ঠা

সরকারি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সৈন্যদের জন্য ২৪ পরগণা জেলায় যে মিলিটারী ব্যারাক ও ছাউনি তৈরী হয়েছিল, সেই পরিত্যক্ত শিবিরগুলিকেই আপাতকালীন পরিস্থিতিতে, উদ্বাস্তু শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

সরকার মূলত তিন ধরণের উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করে-

- 'Women's camps' বা মহিলা শিবির
- 'Worksite Camps' বা কর্মক্ষেত্র শিবির
- 'Permanent Liability Camps' বা স্থায়ী দায়বদ্ধতা শিবির।

উদ্বাস্তু শিবির গুলিতে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। শিবিরের এক একটি ঘরে অন্তত ২০ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়। সেই ঘরে প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে সামান্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তাঁদের প্রাপ্ত স্থানটুকু অন্য পরিবার থেকে পৃথক করার জন্য ভাঙ্গা ইট বা পাথরের টুকরো, নিজেদের ছেঁড়া বস্ত্র খন্ড প্রভৃতি দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু মানুষের সম্ভ্রম বা শালীনতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।[43] সৈন্য ব্যারাকগুলিতেও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর স্থান সংকুলান করা সম্ভব ছিল না। ফলে, সৈন্যদের পরিত্যক্ত তাঁবু দিয়ে সেনা ছাউনির বাইরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী

[42] Ibid., p. 67-68.
[43] Pranati Chaudhuri, *Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distritribution of Refugees Settlements Within the CMD*, Occasional paper, 1988

ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু ফাঁকা জায়গায় তাঁবুর নীচে অসহ্য গরমের ফলে সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

সরকারের পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুদের জন্যে, বিশেষ করে যাদের পরিবারে বা সঙ্গে কোনো পুরুষ সঙ্গী ছিলনা, তাদের জন্য আলাদা করে ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, ভদ্রাকালী যেমন উল্লেখযোগ্য, অন্যদিকে রাণাঘাটে মহিলাদের উদ্দেশ্যে 'Women's home' নির্মাণ করা হয়। মহিলাদের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল পি এল ক্যাম্প, যারা কোনো কাজ করতে পারত না, অনাথ, প্রতিবন্ধী – এই সকলদের এখানে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আরো কয়েকটি জায়গায় পি এল ক্যাম্প নির্মিত হয়েছিল- মেদিনীপুরের দুধকুন্ডী, হগলির বাঁশবেড়িয়া, চাঁদমারি, কূপার্স ক্যাম্প, চামতা, এবং নদীয়ার ধুবুলিয়া। তবে পুনর্বাসন হোক বা সরকারি ডোল কিংবা অন্যান্য সাহায়তা হোক, উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলির ক্ষেত্রে সরকারের নমনীয় ব্যবহার থাকলেও, ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে সরকারের ব্যবহার দ্রুত বদলে যেতে শুরু করে।

১.৯ উদ্বাস্তু শিবিরে সরকারি সহায়তা

উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব সহায়তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উদ্বাস্তুদের নগদ টাকা (ক্যাশ ডোল), পোশাক পরিচ্ছদ, শীতের কম্বল, ঔষধপত্র প্রভৃতি সরবরাহ। এছাড়া শিবিরে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় জল, শৌচাগার, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তানদের জন্য শিক্ষাদানের সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শিবিরের উদ্বাস্তুরা যে সকল সাধারণ সরকারি সহায়তা বা সুযোগসুবিধা লাভ করত তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার -

ডোল সরবরাহ:

শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৬০ টাকা ডোল হিসেবে দেওয়া হত। শিবিরের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক উদ্বাস্তুকে যে ক্ষেত্রে ডোল নগদ অর্থে প্রদান করা হত সেক্ষেত্রে তাঁদের মাসিক ১৩ টাকা করে দেওয়া হত। আর যে ক্ষেত্রে ডোল আংশিক নগদ অর্থে এবং আংশিক রেশনের মাধ্যমে দেওয়া হত সেক্ষেত্রে তাঁরা পেতেন প্রতিমাসে ১৬ টাকা করে। কোন কোন শিবিরে খাদ্যের জন্য খরচ বাবদ উদ্বাস্তুদের মাথাপিছু প্রতি মাসে ১৮ টাকা করে

দেওয়া হত। সদ্যজাত শিশু থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্যও উক্ত হারে নগদ ডোল প্রদান করা হত।[44]

পোশাক পরিচ্ছদ:

শিবিরের উদ্বাস্তুদের পোশাক পরিচ্ছদ বাবদ প্রতিমাসে মাথাপিছু ১৬ টাকা করে দেওয়া হত। আর অসক্ত উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৪ টাকা। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবার কে ২ টি করে শীতের কম্বলও দেওয়া হত।

বাসস্থান:

উদ্বাস্তুদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রে বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ, শৌচাগার ,আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত।

চিকিৎসার ব্যবস্থা:

শিবিরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। শিবিরে ৫৯১ টি শয্যা, ঔষধালয়, রুগীদের জন্য আউটডোর বিভাগ সহ ১৬ টি হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়। বৃহৎ আকৃতির শিবিরগুলির জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দলও ছিল। তাছাড়া প্রতিটি শিবিরে তাদের নিজেদের ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মী ছিলেন।

শিক্ষার ব্যবস্থা:

উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি উদ্বাস্তু শিবিরে প্রথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। যেসব শিবিরে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকত সেখানে মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হত। যে শিবিরে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কম সেখানে আঞ্চলিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হত।

অন্যান্য সুযোগসুবিধা:

উল্লেখিত সাধারণ সুযোগ সুবিধাগুলি ছাড়াও শিবিরের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, উদ্বাস্তুরা আরও বাড়তি কিছু সুবিধাও লাভ করেছিলেন। যেমন- মেয়েদের বিবাহের জন্য অথবা বিধবা মহিলাদের

[44] নীলেন্দু সেনগুপ্ত, দেশভাগ ও *ছিন্নমূল মানব,* কলকাতা: একুশ শতক, ২০১৯, পৃ. ৪৫।

পুনর্বিবাহের জন্য 'বিবাহ অনুদান' দেওয়া হত। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ও শিশুদের জন্য দুধ সরবরাহ করা হত। যক্ষা রোগীদের প্রতিমাসে ৫৫ টাকা হারে বিশেষ ডায়েট আলাউন্স দেওয়া হত। উদ্বাস্তু শিবিরের বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবির গুলিতে ত্রাণ বাবদ ৬১ কোটি টাকা ব্যয় হয়।[45]

বিনোদনমূলক ব্যবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের মনোবল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁদের চিত্ত বিনোদনের কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়। সরকারি উদ্যোগে ১৯৫০ সালে একটি চিত্ত বিনোদন সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ। সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং সম্পাদক শ্রী হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়। এই সাংস্কৃতিক দলটি বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মধ্যে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে এবং তাদের হতাশা কাটিয়ে মনোবল ফিরিয়ে আনার কাজ করত।

উদ্বাস্তুদের জীবন কাহিনী নিয়ে নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায় রচনা করেছিলেন 'ভাঙ্গাগড়া' নামে একটি নাটক।[46] উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকেও নাটকের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে দীর্ঘদিন। এছাড়া স্থানীয় পালাগান, কৃষ্ণযাত্রা, রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির দলগুলিকে দিয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে পালা গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা যাতে তাঁদের সব হারানো দিনগুলির বেদনা ভুলে গিয়ে এই সাংস্কৃতিক বিনোদনের দ্বারা নতুন দিনের দিকে তাকাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত।[47]

১.১০ উদ্বাস্তু শিবির বন্ধের সিদ্ধান্ত

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরগুলি আগামী এক বছরের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্তে আরও বলা হয় যে, শিবিরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকে ১০০০০ টি পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে এবং

---

[45] হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৭০, পৃ. ৮৯।

[46] মন্থন রায়, *ভাঙা গড়া,* পৃ ৪৫

[47] তদেব, পৃ. ৫৬।

বাকিদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দন্ডকারণ্যে বা অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উদ্বাস্তুরা বিরোধী মতামত প্রকাশ করেন এবং একটি বড় সংখ্যক উদ্বাস্তুই এই অনুদান গ্রহণ করেননি। ১৯৬১ সালে সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১.১১ সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থা, পুনর্বাসনে সরকারের নানান পদক্ষেপ

দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি অংশ কোন সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ না করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে তীব্র দরিদ্র ,উদ্যম ও মনোবলহীন উদ্বাস্তুরা সরকারি উদ্বাস্তু শিবির গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭০,০০০। এঁদের মধ্যে ৭৫০০ জন ছিলেন সরকারি পুনর্বাসন গ্রহণ করার পক্ষে অনুপযুক্ত। কেননা, এই সকল উদ্বাস্তুদের পরিবারে শুধু মহিলা ও শিশু ছিল। তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ছিল না। তাই এই ৭৫০০ জন উদ্বাস্তুর আশ্রয় হয়েছিল permanent liability camp এ।[48]

বাকি ৬২০০০ জন উদ্বাস্তুদের এক একটি পরিবার পিছু গড়ে ৫ জন করে সদস্য ধরলে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৫০০ টি। অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড.বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রকের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ১২,০০০ টি পরিবার বা ৬২,০০০ জন উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।[49]

২৪ পরগণা জেলার কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের শিবিরে আশ্রয় দেওয়ার সময়েই পুনর্বাসনযোগ্য এবং পুনর্বাসনযোগ্য নয় এমন উদ্বাস্তুদের পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বাস্তু জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনযোগ্য জমির স্বল্পতা, তদুপরি নতুন উদ্বাস্তুদের আগমন, উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনে যেতে অনাগ্রহ প্রভৃতি বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সমস্যা কে জটিল করে তুলেছিল। এই সম্পর্কে Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal –এ লেখা হয়েছে- ‘The greatest hurdle in the way of rehabilitation in West Bengal has been the acute scarcity of land. The pressure of population in the State was already very high,

[48] Manual of Refugees Relief and Rehabilitation, Vol-1, Government of West Bengal, 2000.
[49] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p.70.

and therefore, the scope of absorption of millions of additional people was extremely limited. On the other hand, the old migrants showed a strong disinclination to move out of West Bengal. Used to plenty of water and fertile soil they found it difficult to adjust themselves to totally different conditions and environments that obtained in places outside West Bengal.'[50]

অন্যদিকে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি ২.০১.১৯৭৯ এই নির্দিষ্ট দিন থেকে নতুন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে। এই শর্ত গুলি হল -

- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যাবতীয় রিপোর্ট, বিশেষ করে ১৯৫৩, ১৯৫৪ সালের রিপোর্ট গুলির পাশাপাশি, ১৯৬৭ সালে, বিভিন্ন কমিটি দ্বারা আলোচিত বা সমালোচিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের রিপোর্ট প্রসঙ্গেও গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।
- পুনর্বাসন দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার কথা বলা হয়।

এই সময়ে উদ্বাস্তু কমিটির সদস্যরা ছিলেন সমর মুখার্জি, ননী কর, ভোলা বসু, আর সি গাঙ্গুলী, রামকৃষ্ণ মজুমদার, জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই কমিটির উপর কতগুলি শর্ত প্রদান করা হয়েছিল-

- কত সংখ্যক পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন তার সংখ্যা নির্ধারণ করা।
- দুই ধরণের উদ্বাস্তু – প্রথমত, যাঁদের পুনর্বাসনের জন্যে সাহায্য প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত, যাঁরা আগেই সাহায্য পেয়ে গিয়েছিলেন- এমন উদ্বাস্তুদের নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- পরিত্যক্ত সরকারি শিবিরগুলিতে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু রয়েছে তা নির্ধারণ করা যেমন প্রয়োজন ছিল, একইভাবে বেআইনিভাবে দখল করা মুসলিমদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু ছিল, তার হিসেব রাখাও এই কমিটির কাজ ছিল।
- উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে কমিটি তার কাজ এগোয়।

১.১২ তৎকালীন পরিস্থিতিতে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগ

[50] Prafulla kumar chakraborti, *The Marginal Men*, p.101.

১৯৪৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের কাছে সহযোগীতা প্রার্থনা করে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[51] তিনি বলেন, পূর্ববাংলা থেকে যে সকল মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন তাঁদেরকে একদিকে যেমন সাহায্য করতে হবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, আবার অন্যদিকে এরকম বাস্তু ত্যাগ যাতে আর না হয় কিংবা উদ্বাস্তুরা যাতে নিজের ইচ্ছায় তাঁদের নিজ স্থান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য একটা সুস্থ-স্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল।

তিনি উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে নির্মিত আশ্রয় শিবিরগুলো তুলে দিতে চেয়েছেন এবং বারংবার পূর্ববঙ্গে যাতে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন।[52] এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, তিনি বলেন, 'আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা একটি অতি জটিল সমস্যা এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ও ভারত গভর্নমেন্ট উভয়কেই ইহা বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ববঙ্গে যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন, সমস্যা তাঁহাদিগকে লইয়াও। সুতরাং যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের জন্যই সাহায্যের ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার মীমাংসা করা যাইবে না; পূর্ববঙ্গ হইতে যাহাতে আরও বাস্তুত্যাগ না ঘটে এবং যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন ও যাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় তাঁহারা যাহাতে পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে উৎসুক হন সেজন্যে পূর্ববঙ্গেও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা আবশ্যক'।[53]

তিনি পৃথক পুনর্বাসন দপ্তর গঠন করেন, যে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে এবং ১৯৪৯ সালের জুন মাসে হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়কে পুনর্বাসন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ড.বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এবং হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ একটা অন্য মাত্রা লাভ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[54]

সরকারের পক্ষ থেকে শিবিরের উদ্বাস্তু পরিবার গুলির পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যেসকল পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী হয় তা উল্লেখ করা হল -

---

[51] নীলেন্দু সেনগুপ্ত, *দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব,* কলকাতা, একুশ শতক, ২০১৯, পৃ. ৯৭।

[52] তদেব, পৃ. ১১১।

[53] তদেব, পৃ. ১১২।

[54] হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৪৮।

- আশ্রয় শিবিরে এমন অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিল যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ক্ষমতা রাখতেন। আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যাতে নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করতে পারে সে বিষয়ে সরকার উৎসাহিত করে। যেসব উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় শিবিরে বাস না করে নিজেদের প্রচেষ্টায় পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য সরকার বাস্তু জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে আর্থিক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই ঋণ পেয়ে বহু উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগেই নিজেদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করেন। এইরূপ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোথায় পুনর্বাসন নেওয়া হবে তা উদ্বাস্তু পরিবারটির প্রধানকে ঠিক করতে হত। উদ্বাস্তু পরিবারের প্রধান বাস্তু জমি ক্রয়ের জন্য জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের দায়িত্বে জমি দখল ও হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতেন। জমি কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হত।
- পূর্ববঙ্গ থেকে যখন ধাপে ধাপে ২৪ পরগণা জেলায় উদ্বাস্তু ঢেউ এসে শিবির গুলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে তখন পুরানো উদ্বাস্তুদের দ্রুত অপসারণ করা দরকার ছিল। কিন্তু আইনের মাধ্যমে জমি দখল করতে গিয়ে অনেক দেরি হয়ে যায় বলে আশ্রয় শিবির থেকে উদ্বাস্তুদের দ্রুত অপসারণ সম্ভব ছিল না। ফলতঃ একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এক্ষেত্রেও।

১.১৩ সরকারের আর্থিক সহায়তা

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। কৃষিকার্য, বসতি নির্মাণ, ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ বা ক্রয় করা হয়। উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ঋণদান, শিবিরের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্ম সংস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, এইসব ছিল সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[55]

১.১৩.১ উদ্বাস্তু কলোনিতে সরকারের নানান উদ্যোগ

পুনর্বাসন দপ্তরের রিপোর্ট (১৯৫৩-৫৪) অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু অভিবাসিত হয়ে আসা প্রথম পর্যায়ের উদ্বাস্তুদের মূলত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা

[55] তদেব, পৃ. ৫০।

করা হয়। প্রায় ২০০০ একর জমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, যার জন্য সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ২৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।[56]

১৯৫৪-৫৫ সালের আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল উদ্বাস্তুরা যাতে নিজেদের মাথা গোঁজার জন্য গৃহ নির্মাণ করতে পারে তার জন্য 'গৃহ নির্মাণ ঋণ' এর ব্যবস্থা করা হবে এবং সেই গৃহ নির্মাণের জন্য জমি প্রদান করবে সরকার। আবার সরকার পক্ষ থেকেও উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারপক্ষ থেকে ১৪,১০৬ টি গৃহ এবং উদ্বাস্তুদের নিজ উদ্যোগে ২,৪৭,২২৭ টি গৃহ নির্মিত হয়েছিল।[57]

উদ্বাস্তুদের হিতার্থে সরকারি তরফে আরো কতগুলি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যেমন উদ্বাস্তুরা যাতে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন, উপার্জন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উদ্বাস্তুদের পলিটেকনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে সরকার ট্রেনিং স্কীম গ্রহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যাদবপুর পলিটেকনিক কলেজ, যা শুরু হয়েছিল ৩২৮ জন উদ্বাস্তুদের নিয়ে, আবার বেলঘরিয়ায় দেশলাই তৈরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উদ্বাস্তুদের নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ১ লক্ষ টাকা। বেলগাছিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র 'বান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির' এ উদ্বাস্তুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতাতে ফোটোগ্রাফি শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একাডেমি অফ ফোটোগ্রাফি ইন্ডিয়াতে প্রায় ২৫ জন উদ্বাস্তুকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতাতে 'Training under the State Organisations Government of West Bengal'এর অধীনে প্রায় ২০০ জন উদ্বাস্তুদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১.১৩.২ পুনর্বাসন প্রসঙ্গে সরকারের পদক্ষেপ

প্রচুর স্কিম পাস করা হয়, কৃষিজাত জমি, বসতভিটা, জমি সরকারের দখলে আনা হয়, লোনের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে 'বায়না নামা স্কীম' এর প্রসঙ্গ আসে। কৃষিকাজ, জমি, বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য-এর পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের জন্য শিক্ষার, চিকিৎসা, জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, চাকড়ির সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মত নানান ব্যবস্থা করা হয়।

---

[56] তদেব, পৃ. ১৬৭।

[57] তদেব, পৃ. ১৭০।

গ্রাম্য এলাকায় উদ্বাস্তুদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হল তা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। গ্রাম্য এলাকার প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার, কৃষিকার্যে নিযুক্ত পরিবার ছিল এবং কৃষিকার্যে যুক্ত নয় এমন পরিবারও ছিল। এই গ্রামাঞ্চলের পরিবার গুলির জন্য চারটি পৃথক পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্কিম আনা হল। যেমন, ইউনিয়ন বোর্ড স্কিম, উদ্যানবিদ্যা স্কিম বা হর্টিকালচারাল স্কিম, টাইপ স্কিম, বারুজীবি স্কিম।

ভোকেশনাল বা কারিগরি প্রশিক্ষণ:

উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েদের জন্য একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়, যাতে তারা কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কিংবা রোজগার করতে পারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ৪৫ হাজার যার মধ্যে ১৭ হাজার মহিলারা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে।[58] ১৯৬০ এর দশকে, শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্র, পলিটেকনিক এ সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান কে সঠিকভাবে চালানোর জন্য সরকার থেকে বিভিন্ন সময়ে অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়। যদিও প্রাসঙ্গিকভাবেই দেখা যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে এমন অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই ৩৮ টি ট্রেনিং তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়। উদ্বাস্তুরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন, কাজ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবের রূপ দানের উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন – রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থা, কলকাতা ও রাজ্য পরিবহন সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প, কো-ওপারেটিভ সোসাইটি। এই ক্ষেত্র গুলিতেও সরকার বারংবার আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের কর্ম সংস্থানেরও ব্যবস্থা করে।

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা:

এই ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে, যাতে তারা একেবারে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। সেই বিষয়ে ভাবা হয়। অর্থাৎ এককথায় 'ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন' বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা। আর যারা খুব ভালো ও আগ্রহী প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী তাদেরকে 'ফ্রী সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড' এর সুযোগ সুবিধা প্রদান

[58] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p.89.

করা।[59] মেধাবী ও যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী দের জন্য, তাদের উচ্চ শিক্ষার পথ যাতে মসৃণ হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বাস্তু শিশুদের জন্য ১৩০০ এরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি বিদ্যালয়গুলিতে যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা গরীব ছাত্র -ছাত্রী তাদের, বই কেনার জন্য, পড়াশোনার জন্য, বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, মেডিক্যাল, কারিগরী পেশাভিত্তিক নানানা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ছাত্র -ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় টিটাগড়, হাবড়া, গয়েশপুর এই সমস্ত জায়গাতে। 'apprenticeship scheme' এর অধীনে মোট ১৫০০ জন উদ্বাস্তু ট্রেনিং পায়।[60]

১৯৬০ সালে, মোট ৪৫ হাজার উদ্বাস্তুদের মধ্যে ১৭ হাজার মহিলারা শ্রমশিল্প, কারিগর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কাজে যুক্ত হয়। পলিটেকনিক, বিভিন্ন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উদ্বাস্তুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রচুর অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা গিয়েছে ১৯৬৪ সালের পর এই ধরণের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মহিলারা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়- সেই উদ্দেশ্যে, মহিলাদের হোমগুলির সাথে লাগোয়া ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উৎপাদন সংস্থা স্থাপন করা হয়। এর মোট সংখ্যা ছিল ৩৮ টি, কিন্তু পুনর্বাসনের কাজ যত এগিয়েছে, এই ধরণের সংস্থা বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যাও ততই পাল্লা দিয়ে কমেছে। অবশেষে মাত্র চারটি অবশিষ্ট ছিল। যার মধ্যে একটি ছিল বাঁশ প্রসেসিং কারখানা যা জাপানি কর্মীদের সহায়তায় চলতো। এখানে ৯০ জন উদ্বাস্তু কাজ করতেন। রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগ, কলকাতা রাজ্য পরিবহন দপ্তরে উদ্বাস্তু যুবকদের ও যুবতীদের কাজের সুযোগ দেওয়া হয়।

কলকাতায়, 'The Rehabilitation Industries Corporation Ltd' নির্মাণ করে ভারত সরকার, উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। ছোট ছোট বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়ে সাহায্য

[59] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p. 90-91.
[60] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees. 94.

করত এরা। ১৯৭৫ এর ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্পোরেশন ভারত সরকার থেকে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ্যের ঋণ পায়।[61]

রাজ্য পরিসংখ্যান দপ্তর এর রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিবাসিত উদ্বাস্তুদেরকে শহুরে এবং গ্রাম্য-এলাকা অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয়। যে কোনো ক্ষেত্রে, উদ্বাস্তুদের কাজ দেওয়ার সময়ে, কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা হত

- পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?
- ঐ পরিবারের যিনি মাথা, তিনি কি কাজ করেন?
- পরিবারের যিনি মূল ব্যক্তি তিনি কত সালে অভিবাসিত হয়েছেন?
- একটি পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা কত?
- ১৯৪৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের পরে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু অভিবাসিত হয়েছেন?

পরিবারের মাথা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা কি কাজ করতেন তা নিয়ে কিন্তু ভাবা হয়নি, বা তাঁদের সামাজিক- অর্থনৈতিক চরিত্র খতিয়ে দেখা হয়নি।

১৯৫০ এবং ১৯৫৫ সালের রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায়, উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার বা শিক্ষিতের হার অনেকটাই বেশী। এর মূল কারণ রূপে বলা হয় সরকারের উদ্যোগ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান। উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার কেমন ছিল, তার একটা হিসেব দেওয়া হল –

বছর	উদ্বাস্তু	
	পুরুষ	মহিলা
১৯৫০	৬৬.৬	১৭.৯
১৯৫১	৩৬.৩	৭.০
১৯৫৫	৭৮.৩	২৯.২

সূত্র: Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, pp.89-110.

[61] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, p. 95.

এমন পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, অন্যান্যদের তুলনায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেকটাই বেশি ছিল।

হাই স্কুল ডিরেক্টরি থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা নির্ধারণ করে উদ্বাস্তুরা কিভাবে শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে দেখেছিলেন।[62] উদ্বাস্তু অভিবাসন, পুনর্বাসন, কলোনি নির্মাণের লড়াই- যেমন একদিকে হচ্ছিল আবার একইসাথে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজও হয়েছিল। নিম্নে তা দেখানো হল-

J. L. No. অথবা মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নম্বর	বিদ্যালয়ের নাম	কত সালে উৎপত্তি	কত সালে সরকারিভাবে অধিভুক্তি হয়
J.L No. 41	কামড়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	২/১/১৯৪৮	১/১/১৯৪৯
J.L No. 48,49	ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়	৪/২/১৯৫০	১/১/১৯৬৫
J.L No. 49	বিনা বালিকা বিদ্যালয়	২/১/১৯৫১	৬/১২/১৯৬৪
J.L No. 59	ঋষি রাজনারায়ন গার্লস হাই স্কুল	২/৬/১৯৫২	১/১/১৯৬৩
J.L No. 44	তেতুলবেড়িয়া অনুকুলচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়	২/১/১৯৫৩	৫/৪/১৯৬১
J.L No. 47	গড়িয়া গার্লস হাইস্কুল	১/১/১৯৫৪	৬/১২/১৯৫৪
Garfa Non Municipal Town	গড়াফা ধিরেন্দ্র নাথ মেমোরিয়াল হাই স্কুল	২/১/১৯৫৬	২/৪/১৯৬২
J.L No. 46	বালিয়া নফরচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়	১৯৫৭	-
J.L No. 24	চাম্পাহাটি গার্লস হাইস্কুল	২/৮/১৯৫৮	১/১/১৯৬১
J.L No. 45	বিনয় বালিকা বিদ্যালয়	২/৪/১৯৫৯	৮/১/১৯৬২
Bansdroni Non Municipal Town	বাঁশদ্রোণি বালিকা বিদ্যালয়	২/২/৬১	১/১/১৯৬৫
J.L No. 13	সুচেতানগর বালিকা বিদ্যালয়	২/২/১৯৬১	১/১/১৯৬৫
J.L No. 95	কালিকাপুর রামকমল বিদ্যালয়	-	-
J.L No. 61	বোড়াল হাই স্কুল	-	-

[62] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees.

J.L No. 47	বড়দা প্রসাদ হাই সেকেন্ডারি স্কুল	-	-

সূত্র: Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation O Refugees, pp. 70-95.

চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা:

উদ্বাস্তুদের যথার্থ চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে, বহু সংখ্যক সাধারণ হাসপাতাল নির্মিত হয়। যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়। একাধিক ছোট ছোট ক্লিনিকও গড়ে ওঠে এই সময়ে। সরকার পক্ষ থেকে ৭ কোটি ৭ লক্ষ্যের একটা বৃহৎ অঙ্কের টাকা ধার্য করা হয় শুধুমাত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রেই।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার পক্ষের একাধিক সীমাবদ্ধতা ছিল একথা যেমন অস্বীকার করা যায় না, আবার উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানান সমস্যার দ্রুত ও প্রয়োজনীয় সমাধানের চেষ্টা করেছে এবং সেই চেষ্টাকে পরিপূর্ণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে, একথাও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। সরকারি নানান রিপোর্ট এ প্রমাণ বহন করে।

এই রিপোর্ট গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

- রিপোর্ট অফ দি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি , ভারত সরকার, ১৯৫৩
- রিপোর্ট অফ কমিটি অফ মিনিস্টার্স , ভারত সরকার
- রিপোর্ট অফ দি কমিটিস অফ রিভিউ অফ ১৯৫৪, রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল।
- রিপোর্ট অ্যান্ড রেকমেন্ডেশন অফ দি গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৬৭।
- মাস্টারপ্ল্যান ফর ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন অফ ডিসপ্লেসড পারসনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৭৩
- রিপোর্ট অফ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন দ্য রেসিডুয়েল প্রবলেম অফ রিহ্যাবিলিটেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ১৯৭৬।
- পেপার অফ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্ট, সাবমিটেড টু দ্যা সেভেন্থ ফিন্যান্স কমিশন।
- মেমোরেন্ডম অফ দি ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল টু দি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ১৯৭৮
- আর আর কমিটি'স রিপোর্ট ১৯৮১

- দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল অল পার্টি ডেলেগেশান টু দিল্লি, ১৯৯২

উপরিউক্ত রিপোর্ট গুলিতে বিভিন্ন সময়ে, সরকার উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে।

এবার আসা যাক উদ্বাস্তু মহিলা প্রসঙ্গে। সরকার উদ্বাস্তু মহিলাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'Women's resettlement section' নির্মিত হয় বিভিন্ন জেলাগুলিতে। একাধিক ক্যাম্প ও হোমের ব্যবস্থা করা হয় যার দায়িত্ব ছিল জেলা কর্তৃপক্ষের উপর। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

- ধুবুলিয়া হোম ও হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া।
- চামতা মহিলা হোম ও হাসপাতাল, নদীয়া
- কুপার্স স্থায়ী দায়িত্ব প্রদানকারী হোম, নদীয়া
- রাণাঘাট মহিলা হোম, নদীয়া
- চাঁদমারি সংযুক্ত মহিলা হোম, নদীয়া
- হাবড়া সংযুক্ত হোম, উত্তর ২৪ পরগণা
- টিটাগড় মহিলা হোম, উত্তর ২৪ পরগণা
- ভদ্রাকালী মহিলা হোম, হুগলী
- বাঁশবেড়িয়া মহিলা হোম, থানা- চুঁচুড়া, হুগলী

এই সকল হোমে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁদেরকে ক্যাশ ডোল, চাল, গম, ডাল এসবের পাশাপাশি জামাকাপড়, কম্বল ইত্যাদি বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয় পরিচালনার দায়িত্বে ছিল সাব-ডিভিশানাল ও জেলা কর্তৃপক্ষ। আর চিকিৎসার বিষয়টি পরিচালনা করেছিল স্বাস্থ্য বিভাগ। পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছ সরকার ছয়টি হোম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে, ধুবুলিয়া, চামতা, রাণাঘাট, কুপার্স, টিটাগড় ও ভদ্রাকালীর নাম উল্লেখযোগ্য।[63] অন্যদিকে, বাকি তিনটি হোম চাঁদমারি, হাবড়া ও বাঁশবেড়িয়া এগুলি অটুট রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে সরকারের মূল উদ্দেশ্যে ছিল কিছু উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। খালি জমিতে, প্লট ভাগ করে সেখানে পুনর্বাসন প্রদান করা ।

তবে, আলোচনার শেষে একথা প্রসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে উদ্বাস্তু অভিবাসন হোক কিংবা উদ্বাস্তু ত্রাণ বা পুনর্বাসনের মত বিষয়ই হোক না কেন- একটা বিভাজনের রাজনীতি চোখে পড়ে।

[63] Ministry of Supply and Rehabilitation, Annual Report on Evacuation, Relief and Rehabilitation o Refugees, p. 97.

১৯৬১-৬২ সালের একটি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অভিবাসিত হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল ২,২৯,৬২৩ লক্ষ টাকা, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল ১,৩১,৮৯০ লক্ষ টাকা। এরূপ একইরকম বিভাজন সরকারি চাকরি ক্ষেত্রেও একইভাবে চোখে পড়ে। সমস্ত সরকারি বিভাগে বাঙালি উদ্বাস্তুদের অপেক্ষায় পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের অনেকবেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। সেখানেও সরকারের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা গিয়েছে বারংবার। কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ২ লক্ষ ২ হাজার জন উদ্বাস্তু যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন তাঁদের সরকারি বা আধাসরকারি বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্ম সংস্থান দপ্তরেও প্রায় ৮০,০০০ জন উদ্বাস্তুর চাকরি হয়। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ছবি চোখে পড়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কেন্দ্র দ্বারা মাত্র ২০৪ জন উদ্বাস্তুর চাকরি হয়।[64] উভয়ের মধ্যেকার এরূপ অসামঞ্জস্যতা থেকে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না, ঠিক কেমন বিভাজনের রাজনীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল এরূপ বিভাজন কেনো সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এ বিষয় নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। এমনটা বলা হয়েছে 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত মোট ৪৭.৪০ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র খরচ করেছিল ৪৫৬ কোটি টাকা, আর পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় হয়েছে মাত্র ৮৫ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, সরকারি বিভাজনকে মাথায় রেখে বলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রদানের ক্ষেত্রে যেরূপ আগ্রহ ও তৎপরতা দেখা গিয়েছিল তার ঠিক বিপরীত চিত্রপট ফুটে উঠেছিল পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে। পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, বোম্বাইয়ের মতন জায়গাগুলিতে, মুসলমানদের ত্যাগ করে চলে যাওয়া বাড়িতে কিংবা সরকার দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হলেও, পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের সেরূপ উদ্যোগ তো দেখা যায়ই নি উপরন্তু লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের ব্যবস্থা করে সরকার তাঁদের জীবনকে আরো জটিল করে তুলেছিল।[65] অর্থাৎ একই ঘটনায়, একই পরিস্থিতির শিকার হয়েও, একটা ব্যবধান স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পরিকল্পনার ব্যার্থতার জন্য বারংবার সরকারী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে দায়ী করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন - 'পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের লইয়া সরকার যে

[64] Amrita Bazar Patrika, March 8, 1951.
[65] Ibid., p. 6.

হৃদয়হীনতা, পরিকল্পনাহীনতা ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাই বাস্তুহারাদের অবস্থা আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে, পুনর্বাসনের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাহাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি না থাকিলে বাস্তুহারাদের জীবিকার প্রশ্নকে প্রাধান্য না দিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না'।[66]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'উদ্বাস্তু' সমস্যার কথা বলতে গিয়ে একে একটি এমন এক ব্যাধির সাথে তুলনা করেছেন যে ব্যাধির কোনো নিরাময় হয় না। এই সমস্যাকে তিনি একটি 'জটিল সমস্যা' হিসেবে দেখেছেন এবং বারবার এই সমস্যার সাথে জড়িত অসংখ্য উদ্বাস্তুদের তিনি তৎকালীন সমাজেরই 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে চিহ্নিত করেছেন।[67] উদ্বাস্তুদের যে ধরনের কঠিন পরিস্থিতি, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তার জন্য তিনি সরকার তথা নেতাদেরকে দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম জার্মানীর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন, 'বাস্তুহারা দিগকে পশ্চিম জার্মানীরই অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল, পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাকে যেরূপে একটা অবাঞ্ছিত আপদ বলিয়া মনে করা হইয়াছে, পশ্চিম জার্মানীতে তাহা করা হয় নাই'।[68] তিনি আরো বলেন - 'অর্থনৈতিক পুনর্বাসনই যে বাস্তুহারা পুনর্বাসনের মূল কথা এই সত্য পশ্চিম জার্মানীতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ছেলেরা যেমন বাড়ির আনাচে কানাচে যেখানে সেখানে গাছ লাগাইয়া পরদিনই আসিয়া সেই গাছ উঠাইয়া দেখে শিকড় বাহির হইয়াছে কিনা তেমনি আমাদের দেশের সরকার বাস্তুহারাদিগকে যেখানে খুশি পাঠাইয়া আশা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পুনর্বাসন হইয়া যাইবে। তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের যে প্রশ্নটি মৌলিক ও প্রাথমিক সেদিকে সরকার দৃষ্টি দেন নাই'।[69]

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আশানুরূপ আশ্বাস বা সাহায্যের হাত পান নি। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই যখন কেউ এগিয়ে আসে না বা কোনো সাহায্যের হাত পাওয়ার আশা থাকে না তখন নিজেকেই লড়াই করে বা জোর করেই ছিনিয়ে নিতে হয় নিজ জায়গা যেটা বুঝতে খুব বেশী দেরি করেনি উদ্বাস্তু মানুষেরা। সেখান থেকেই শুরু হল জোর করে জমি বা জায়গা দখলের

[66] ibid., p. 8.
[67] Prafulla Kr. Chakrabarti, *The Marginal Men*, p.15-16.
[68] Ibid., p.45.
[69] Ibid., p.46.

লড়াই। এখান থেকেই আমরা পরিচিত হয়েছি 'জবর দখল কলোনি'র সাথে।[70] যদিও জবরদখলীকৃত কলোনি জমিকেও একটা ন্যায্য মূল্যের ভিত্তিতে কিস্তির ব্যবস্থা করার কথা বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। পুনর্বাসনে, যে সকল পরিবার কোনো রকমের জমি পায়নি, তাঁদের পাশে দাঁড়ায় রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গ। বলাবাহুল্য, কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তুরা একের পর এক জবরদখল কলোনি নির্মাণ করেছে কিন্তু এই নির্মাণপথ যে খুব সহজ ছিল তা একেবারেই নয়। এই জমি দখলে একদিকে যেমন ছিল আইনগত বাধা, আবার আরেকদিকে ছিল জমির মালিকদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের বাধা। প্রথমদিকে এই কলোনিগুলির অধিকাংশকেই তৎকালীন সরকার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। আমার পরবর্তী অধ্যায় এই উদ্বাস্তু কলোনি নিয়ে। অভিবাসন, ত্রাণ, পুনর্বাসন এসবের নানান সীমাবদ্ধতা, সমস্যার গন্ডীকে অতিক্রম করেও কিভাবে একের পর এক উদ্বাস্তু কলোনির নির্মাণ হয়েছে, সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই পরবর্তী অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

[70] Ibid., p.57.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন: মুখের কথায় ইতিহাস

উদ্বাস্তু সমাজের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সরকার বা রাজনৈতিক নেতাবর্গ। তাই উদ্বাস্তুরা জোট বেঁধে কলকাতা বা দক্ষিণ শহরতলীর নানান প্রান্তে নিজেদের মাথা গোঁজার স্থানের সন্ধান করেছেন। এই নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্যে দিয়েই আমরা উদ্বাস্তু সমাজের আভ্যন্তরীণ উদ্ভাবনী শক্তির সাথে পরিচিত হতে পারি। বলাবাহুল্য, যেকোনো বড় ধরণের ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব থাকে। দেশবিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসনের বিষয়টিও ঠিক তাই। মানুষের কি মনে করতে চায় বা কি সে ভুলতে চায়, সেটার হদিশ তার স্মৃতিচারণা থেকে অনুমান করা যায়। দেশত্যাগের যন্ত্রণায় মর্মাহত মানুষেরা কিভাবে এই হারানো দেশকে পুঁজি করে নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন, তা ভাবার বিষয়।[1] কিভাবে কলকাতা শহরতলীতে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠে এই অধ্যায় সেই বিষয়কেন্দ্রিক। কারা, কোন সময়ে এই কলোনিগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা এই নির্মাণ কার্যে কতটা সফল হয়েছিলেন তা সন্ধান করাই আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়।

২.১ উদ্বাস্তুদের নিজ তাগিদে কলোনি প্রতিষ্ঠা

পূর্ব পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বা কলকাতা দক্ষিণ শহরতলীতে আগত উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ সরকারী উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। এরা কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে থাকলে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। এই কারণে ১৯৫০ সালে যখন নতুন করে উদ্বাস্তু স্রোত ২৪ পরগণায় আছড়ে পড়ে তখন বহু উদ্বাস্তুকে শিবিরে স্থান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এমন অবস্থাতে, উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশ সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের উদ্যোগে ও চেষ্টায় বসতি প্রতিষ্ঠার কাজে নামে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা বিভিন্ন সরকারি জমি বা কোন ধনী ব্যক্তির পরিত্যক্ত জমিতে রাতারাতি খুঁটি পুঁতে ও সামান্য ছাউনি দিয়ে বসতি নির্মাণ শুরু করেন। এভাবে বসতি স্থাপন করা উদ্বাস্তু

[1] ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা মন্ডল রায়, পৌলমী ঘোষাল (সম্পাদিত), *ধ্বংস ও নির্মাণ: বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের সুকথিত বিবরণ,* কলকাতা: সেরিবান, ২০০৭, পৃ. ৭৬।

কলোনিগুলি 'জবরদখল কলোনি' নামে পরিচিত। প্রথমে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় এবং ২৪ পরগণা জেলাতেই এরূপ জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়।[2] ১৯৫০ সালে একের পর এক জবরদখল কলোনিগুলি গড়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার শরনার্থীদের চেষ্টায়।

১৯৫০ সালের শেষ দিকে কলকাতার চারিদিকে প্রায় ২,১৯২ একর জমি দখল করে এই ধরণের অন্তত ১৪৯টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে।[3] এগুলিতে প্রায় ৩০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের আশ্রয় হয়। এরকম করে কলোনি স্থাপনের জন্য উদ্বাস্তু নেতারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করে কোন পতিত বা পরিত্যক্ত জমি নির্বাচন করত। এরপর একদিন হঠাৎ রাতের অন্ধকারে নিজেদের লোকজন নিয়ে গৃহস্থালির জিনিসপত্র নিয়ে সেইস্থানে নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলতেন। তারা অস্থায়ীভাবে বাঁশ বা লাঠির খুঁটি পুঁতে নিজ পরিবারের পাটি, শাড়ি, চাটাই প্রভৃতি দিয়ে তা ঘিরে নিজ জায়গা নির্দিষ্ট করতেন। রাতারাতি সেখানে উনুন তৈরি করে রান্নাবান্না শুরু করে দিতেন। পরের দিন সকালবেলা জমির মালিকের বা সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধিতা আসবে তা জেনেই নিজেরা দলবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতেন। বিরোধ বা বাধা থাকলেও উদ্বাস্তুদের সেই সব কলোনি থেকে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি।[4] সরকারের পক্ষ থেকে এই সকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব ছিলনা বলেই ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়ে ওঠা জবরদখল কলোনিগুলিকে পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদন পায়। কিন্তু জবরদখল কলোনি ছাড়াও উদ্বাস্তুরা কখনো কখনো নিজেদের উদ্যোগেও কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে কলোনিগুলিকে 'প্রাইভেট' বা 'ব্যক্তিগত কলোনি' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সরকারি বাধা, আঞ্চলিক বাধাকে অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গীয় মানুষগুলির জবরদখল কলোনি নির্মাণের ইতিহাস চিরস্মরণীয় বিষয়। সরকারি নির্দেশে পুলিশের দখল করা জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে কলোনিগুলিতে বারংবার আক্রমণ করেছিল, তখন উদ্বাস্তুরা একত্রিত হয়ে নিজেদের বাড়ির নানান কাজের জিনিসকেই হাতিয়ার বানিয়েছে প্রতিরোধ চালিয়েছিল।[5] এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ শহরতলীর কথা ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। নেতাজী নগর উদ্বাস্তু কলোনির প্রশান্ত কুমার সুর যিনি ইউ. সি. আর. সি.-র নেতা ছিলেন তিনি এই প্রক্রিয়ার বর্ণনায় বলেন, 'এভিকশন

[2] তদেব, পৃ. ৭০।

[3] তদেব, পৃ. ৭৪।

[4] তদেব, পৃ. ৭৭-৭৮।

[5] তদেব,পৃ. ৪৫।

বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন এমন জোরদার হয়েছিল যে, রাজ্যের কোথাও কোন জবরদখল জমি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ...কখনো কোন জমিতে বা এলাকার পুলিশ হাজির হলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া অস্ত্র, লাঠি, দাঁও ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে উদ্বাস্তু পুরুষ ও মহিলারা এসে হাজির হয়ে যেত।'[6] ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ণে বাস্তুহারা মানুষের জবরদখল কলোনি গড়ার আন্দোলনকে যেভাবেই বিবৃত করা হোক না কেন, হাজার হাজার পরিবার নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করার কাহিনী একটি গঠনমূলক দৃষ্টান্ত।[7]

এখানে তো শাঁখের করাতে
দিনগুলি কেটে যায় করাতের দাঁতে,
সীমানার দাগে জমাট রক্তের দাগ-
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।
তবু এল স্বাধীনতার দিন,
উজ্জ্বল রঙ্গীন,
প্রানের আবেগে অস্থির-
ডাক দেয় সাজ পদ্মা, পিতা সিন্ধুতীর। [8]

১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শহর ও শহরতলির সরকার দ্বারা স্বীকৃত কলোনিগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে কমিটি নির্মাণ করা হয়। জবরদখল করে নির্মিত কলোনিগুলিতেও একাধিক কমিটি গড়ে ওঠে। কলোনির যে কোন ব্যাপারে এই কমিটিগুলির অবদান ছিল অনেকটাই। অন্যদিকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি ২/০১/১৯৭৯ থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ শুরু করার সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যাবতীয় রিপোর্ট, বিশেষ করে ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের রিপোর্ট ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণে করা।[9] উদ্বাস্তু কমিটির সদস্যরা ছিলেন সমর মুখার্জি, ননী কর, ভোলা বসু, আর সি গাঙ্গুলী, রামকৃষ্ণ মুজুমদার, জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

---

[6]. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৭০, পৃ. ৪৪।

[7] তদেব,পৃ. ৬৭।

[8] মননকুমার মন্ডল, *পার্টিশান সাহিত্য: দেশ-কাল-স্মৃতি*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৪, পৃ. ৭৮।

[9] Government of India, *Estimates Committee Report 1959-60, 96th Report (second Lok Sabha), Ministry of Rehabilitation (Eastern Zone)*, Lok Sabha Secretatiat, 1060, p. 60.

এই কমিটির কাজ ছিল - (ক) কত সংখ্যক পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন তার সংখ্যা নির্ধারণ করা, খ) যাদের পুনর্বাসনের জন্যে সাহায্য প্রয়োজন এবং যারা আগেই সাহায্য পেয়ে গিয়েছিলেন, এই দুই ধরণের উদ্বাস্তুদেরই নির্ধারণ করা প্রয়োজন (গ) পরিত্যক্ত সরকারি শিবিরগুলিতে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু রয়েছেন তা নির্ধারণ করা (ঘ) বেআইনিভাবে দখল করা মুসলিমদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু ছিল তা নির্ধারণ করা (ঙ) উদ্বাস্তুদের আর্থিক সঙ্গতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করা।

কলোনি জীবনের সংগ্রাম ও সংকটের কাহিনী সাহিত্য, ইতিহাস, সরকারী নথি, দস্তাবেজ, থেকে যেমন গঠন করা যায় তেমন সামগ্রিক ক্ষেত্র সমীক্ষা অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের নিজেদের মুখে তাদের নিজেদের উপলব্ধি, তাদের জীবন গাঁথা, স্মৃতিকথাকে লিপিবদ্ধ করেও করা সম্ভব। এই অধ্যায় আমরা উদ্বাস্তু কলোনি জীবন কীভাবে এবং ঠিক কতটা আর পাঁচটা অন্যান্য জীবন থেকে আলাদা তা জানার চেষ্টা করবো। এই অধ্যায়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি কলোনির প্রেক্ষাপটে কলোনি জীবনের সংগ্রামের ইতিহাস ও বর্তমানকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করা হবে। এই জন্য আমি কলকাতা দক্ষিণ শহরতলির কয়েকটি নির্বাচিত কলোনি নিয়ে যেমন কাজ করেছি তেমনি আবার কলকাতা থেকে দূরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প নিয়েও সমীক্ষা করেছি।

২.২ আজাদগড় কলোনি

কলকাতা দক্ষিণ শহরতলীর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বাস্তু কলোনি হল মিনাপাড়া রোডের পশ্চিমে অবস্থিত আজাদগড় কলোনি। এই কলোনি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

কলোনির নির্মাণ:

১৯৫০ সালের ১৭ই জানুয়ারী যাদবপুরের একটি জঙ্গলময় অঞ্চলকে পরিষ্কার করে সেই স্থানে গড়ে ওঠে আজাদগড় কলোনি। এই কলোনি নির্মাণে মাথাপিছু খরচ হয় ১০ টাকা। তার সাথে বাঁশ ও হোগলা পাতাকে অবলম্বন করে সকলের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছিল বসতি নির্মাণ। প্রধাণত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতির লোকের সংখ্যা অধিক হলেও কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরাও এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবার যাদের কোথাও কোনো জমি নেই, যারা সহায়সম্বলহীন, নিঃস্ব তারাই এই অঞ্চলে প্লট পাওয়ার জন্য নির্বাচিত

হয়েছিলেন।[10] প্রতিটি পরিবারের জন্য তিন কাঠা করে জমি নির্ধারিত হয়। আশ্রয় প্রার্থীদের চাপে আজাগড় প্রতিষ্ঠার পঞ্চমদিনে নির্ধারিত হয় যে কলোনির পশ্চিম প্রান্তের 'ক্যালকাটা প্রপার্টিজ'-এর জমিতে আজাদগড়ের সম্প্রসারণ হবে। প্লট বন্টনের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কথা জানা গিয়েছিল -

- যারা প্লটে ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় রসদের জোগান দিতে পারবেন অর্থাৎ বাঁশ, টালি ও বেড়া-এগুলো এনে জমা করতে পারবেন তাদেরই প্লট প্রদান করা হবে।
- প্লট বিলির সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ঘর তুলতে হবে।
- ঘর তোলার পরেই সপরিবারে সেখানে বসবাস করতে হবে। যিনি বা যারা এই শর্ত পূরণে সক্ষম হবেন তারাই প্লট পাবেন এবং যারা এই শর্ত পূরণে ব্যার্থ হবেন তাদের প্লট অন্যজনকে দিয়ে দেওয়া হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং উদ্বাস্তু নেতা ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী ছিলেন এই কলোনি নির্মাণের প্রাণপুরুষ। তারই প্রচেষ্টায় এই কলোনি নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয় ও কলোনির নামকরণ করা হয়। কলোনিকে পরিকল্পনামাফিক পরিচালনার জন্য একটি আভ্যন্তরীণ সমতি ছিল যার নাম 'পূর্ববঙ্গীয় অগ্রদূত সঙ্ঘ'।[11] এই কলোনি নির্মাণের কাজে সহায়তা করার জন্য পার্শ্ববর্তী বিজয়গড় কলোনির বেশ কয়েকজন পাশে এসে দাঁড়ান যেমন সর্বশ্রী কার্তিক ঘোষ, চন্দন রায় চৌধুরী, কুলেন্দু সোম, পীযূষ সোম, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য এবং শচীন সেন। প্লট হোল্ডার যারা এগিয়ে এসেছিলেন স্বেচ্ছাসেবকের কাজে তাদের মধ্যে সলিল ঘোষ, সমর ঘোষ, জগদীশ গুহ, বীরেন দাস, মধু চ্যাটার্জী, শান্তি বণিক, অমূল্য দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আজাদগড় ১ নম্বর ওয়ার্ডে কলোনি নির্মাণকাজ শুরু হলে স্থানীয় বিজয়গড় কলোনি থেকে সাময়িক ঝামেলা শুরু হয়।[12] আজাদগড় কলোনি নির্মাণের পথে বারংবার পারিপার্শ্বিক নানান বাধা-বিপত্তির আসে। কখনো মার দাঙ্গার মতন পরিস্থিতিও হয়েছে। কিছু দরিদ্র মুসলিম পরিবার ছিল যারা আজাদগড়ের কলোনি নির্মাণ কার্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল যেমন আজাহার, রহমান, নাদু, লুতফর রহমান যাদের বাড়ির জিনিস তছরূপ করা হয়। ফলত গরিব মুসলিম যারা

[10] Biman Samaddar, "The Other Voices of Refugee Colonies of Calcutta & Suburb: The Mainstream History & Reflections on Literature", *Partition Literature: An Open Praxis*, Kolkata: School of Humanities, NSOU, 2016, pp. 46-56.
[11] Ibid. p. 52.
[12] ভুপেন দাশ, [৫৯, আজাদগড় কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.০৫.২০১৮।

তখনও ছিল তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও ইন্দুবরণ গাঙ্গুলীর উদ্যোগে একটি ক্ষণস্থায়ী সম্মিলিত শান্তি বাহিনী গড়ে তোলা হয় যার কাজ ছিল পাহারা দেওয়া।[13] পরিস্থিতির চাপে ও উদ্বাস্তুদের একাংশের উস্কানিতে মুসলিমরা এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে। একদিকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অন্যদিকে পার্শ্ববর্তীদের আক্রমণের মধ্যে দিয়েই কলোনি সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আজাদগড় এমন একটি জায়গায় অবস্থিত ছিল যেখান থেকে মিল, অফিস, কারখানা— এগুলির সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করার সুবিধা হয়। সুপরিকল্পিত ভাবে উদ্বাস্তুরা নিজেদের কঠোর পরিশ্রম, উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় তৈরী করেছিল উদ্বাস্তু নগরী আজাদগড়। যে কোন জমি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল জমির ছবি এঁকে পরিকল্পনা করে জমি ভাগ করা। প্রচুর নলকূপ, স্কুল, বাজার, দোকান নির্মাণ করা হয় সমগ্র উদ্বাস্তু কলোনি জুড়ে।[14] ইন্দুবরণ মহাশয় আজীবন কলোনির প্লট বন্টন, কলোনির নানান সমস্যার সমাধানে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই কলোনি বা কলোনি সম্পর্কিত বিষয় কি আদৌ গুরুত্ব পেয়েছে? তার উত্তর সন্ধান করার চেষ্টা করবো।

রাজনৈতিক পরিমণ্ডল:

কলোনির অভ্যন্তরে এবং কলোনি বনাম কলোনি দ্বন্দ্বে বা জমি দুর্নীতর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। মূল লড়াইটা ছিল উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং নবনির্মিত উদ্বাস্তু কলোনিগুলির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল ও বিস্তার। আজাদগড় কলোনির উপর বিজয়গড় কলোনির বারংবার আক্রমণ ও খেলার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে প্রবল লড়াই পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল। উদ্বাস্তু ঐক্যে স্পষ্ট ফাটল লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[15] এই পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজাদগড় কলোনি লাগোয়া আরেকটি কলোনি নেতাজি নগর কলোনি। এই নেতাজি নগর কলোনিতে পুলিশী হামলার পর, জ্যোতিষ জোয়ারদার নামে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি আজাদগড়ের এক বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[16] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ আজাদগড় কলোনির প্রাণপুরুষ ইন্দুবরণ গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তারের

[13] রমা গাঙ্গুলী, [৭০, আজাদগড় কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.০৫.২০১৮।

[14] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, *কলোনি স্মৃতি,* কলকাতা।

[15] সুজিত সরকার, [৬০, আজাদগড় কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১২.০৮.২০২১।

[16] বেনীমাধব সরকার, [৬০, আজাদগড় কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.১০.২০২১।

জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তিনি কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে আজাদগড় কলোনি নির্মাণে কমিউনিস্ট শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই এই কলোনিতে পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ইন্দু বরণ গাঙ্গুলী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য এবং আর এস পি'র সদস্য দেবকুমার বন্দোপাধ্যায় একত্রিত হয়ে একটি 'সিক্রেট কমিটি' নির্মাণ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবেশী কলোনির উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা।[17]এরা 'আজাদগড় রিফিউজি কমিটি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন যা গড়ে ওঠা বাড়ি-ঘরগুলির বিরুদ্ধে যেকোনো আক্রমণকে প্রতিহত করার কাজ করত। এছাড়াও কলোনির বাইরের নানা বিষয়েও এরা সচেতনপূর্ণ যোগদান করেছিল।

২.৩ সংহতি কলোনি

দক্ষিণ কলকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সংহতির নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের ২২ শে মে সংহতি কলোনির নির্মাণ হয়।

কলোনির উৎপত্তি:

যাদবপুর টালিগঞ্জ অঞ্চলে সংহতি কলোনি গড়ে ওঠে। বিজয়গড় অঞ্চলের কিছু অংশ জমিতে তৎকালীন বিজয়গড়ের নেতারা ব্যাবসা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে সংহতির উদ্যোগে 'সংহতি কলোনি' নির্মিত হয়। এই কলোনি গড়ে ওঠার পিছনে যাঁরা হাতে হাত মিলিয়েছিলন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হল মধুসূদন ব্যানার্জী, সন্তোষ কুমার সমাদ্দার, হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, অনিল চ্যাটার্জী প্রমুখ।[18] এই কলোনি নির্মাণের প্রাণ পুরুষ মধুসূদন ব্যানার্জীর নামে নির্মিত হয়েছে 'মধুসূদন সরণী'। আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি এই কলোনি গড়ার কাজে সচেতনভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি হল সন্তোষ কুমার সমাদ্দার। একদিকে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী আবার অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত কাজের, নিরহংকারী ও প্রচারবিমুখ একজন মানুষ।[19] সংহতি কলোনির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেমন চিন্তাহরণ ঘোষ, ননীগোপাল মজুমদার, সতীশ চ্যাটার্জী, মানিক চক্রবর্তী, অমূল্য গাঙ্গুলী, সুধীরচন্দ্র নাগ, নিকুঞ্জবিহারী নাথ, বিজয়কৃষ্ণ ব্যাপারী, নিশিকান্ত বিশ্বাস, জানকী

[17] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী 'কলোনি স্মৃতি', প্রাগুক্ত।

[18] অমল ব্যাপারী, [৫২, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.০২.২০২০।

[19] অনির্বান নাথ, [৫৫, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.০২.২০২০।

শীল, গান্ধী সাহা, যতীন মজুমদার, রমনীমোহন গুহ রায়, পুলিন ঠাকুরতা, সুবল নাথ, সাধন ভৌমিক, রাধাবল্লভ বণিক, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, গিরিন চক্রবর্তী, শচীন গুহ, যতীশ চন্দ্র দাস, পরেশ শীল, বিনয় বণিক প্রমুখ।

কলোনি গড়ার কাজে, রাস্তাঘাট নির্মাণে, প্লটে প্লটে সীমানা বিরোধে, জমি জরীপ করে নানান সমস্যা মেটানো-এ সমস্ত বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল কংগ্রেস কর্মী সন্তোষ কুমার সমাদ্দার মহাশয়ের। সংহতি কলোনির আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সবার প্রিয় 'দাদু' হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।[20] উদ্বাস্তু আন্দোলনে যুক্ত, স্বদেশ প্রেমিক, সৎ ও সরল প্রকৃতির এই মানুষটি অঞ্চলে অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা খুব অল্পদিনের মধ্যেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম মেয়েদের নিয়ে একটি একাঙ্ক নাটিকা করে সমগ্র অঞ্চলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

বাঁশবন, কাঁটা গাছের জঙ্গল পরিষ্কার করে এই সংহতি কলোনি তৈরী হয়েছিল। কলোনি নির্মাণের নেপথ্যে, পুলিশি ঝামেলা-বাধা ছিল অপরিসীম। এই সময় একমাত্র থানা ছিল যাদবপুর থানা। প্রথমদিকে উদ্বাস্তুরা হোগলা পাতা, বাঁশ, বেড়া-এসব সামগ্রী ব্যবহার করেই ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছিল। যদিও সামান্য কিছু সামর্থ্য পরিবার নিজেদের বাড়ি নির্মাণের কাজে টালি, টিন-এসব ব্যবহার করা হত। কিন্তু অনেক সময়েই পুলিশ অকস্মাৎ হামলা করে বাড়িগুলি ভেঙে দিয়েছিল।[21] এসকল নানান সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক সমিতি যার নাম 'দক্ষিণ কলকাতা বাস্তুহারা সংহতি' গড়ে উঠেছিল। যেহেতু এরই তত্ত্বাবধানে এই কলোনির নির্মাণ তাই এই কলোনির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সংহতি কলোনি'।[22] রায়পুর মৌজার অন্তর্গত, সরকারী খতিয়ানে জে এল নং ৩৩ নং-এ রয়েছে সংহতি কলোনিটি। মাত্র ৩২-৩৩ টি পরিবার নিয়ে এই কলোনির সৃষ্টি।

১৯৫১ সালের সময়কালে জমিগুলিকে প্লটে ভাগ করার কাজ শুরু হয় এবং সমগ্র ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সাল যাবৎ জমিগুলিকে প্লটে ভাগ করার কাজ চলেছিল। এই সময়েই সরকার এই কলোনিকে 'Squatters colony'- রূপে রূপায়িত করে। বাস্তুহারা সংহতির প্রথম সভাপতি ছিলেন সুকুমার ব্যানার্জী এবং সম্পাদক ছিলেন তারক রায়। এই সমিতির মাধ্যমেই

[20] অনিমেষ বণিক, [৬০, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৩.০৬.২০২১।

[21] পিনাকী মজুমদার, [৭২, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.০৯.২০২২।

[22] অমল সাহা, [৬৫, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.৯.২০২২।

সমগ্র কলোনিতে শান্তি ফিরিয়ে আনা, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে পথ-ঘাট নির্মাণ করা, বাজার নির্মাণ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শিক্ষা:

কলোনির মেয়েদের কথা মাথায় রেখে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এই কাজে অগ্রণী অবদান রেখেছিলেন মনোরঞ্জন হালদার, শশাঙ্ক মুখার্জি মহাশয়, দুলাল মহাশয় প্রমুখ। নিজেরাই প্রবল উদ্যোগে মাটি কেটেছেন, মুলী বাঁশের বেড়া বানিয়েছেন। এই কাজে যুক্ত সন্তোষ কুমার সমাদ্দার সমগ্র কলোনির মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।[23]

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে যথাযথ শিক্ষা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করার এক অদম্য জেদ ও তাগিদ থেকেই 'রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' নির্মিত হয় মেয়েদের জন্যে। ক্রমেই এই বিদ্যালয় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্ধিত হয়। এই বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে একমাত্র কলোনির উদ্বাস্তুরাই হাতে হাত মিলিয়েছিলেন যাতে কলোনির মেয়েরা কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে। কোনো রকমের সরকারি সাহায্য সেই সময়ে পাওয়া যায়নি। একইভাবে কোনোরকমের সরকারি সাহায্য ছাড়াই আরো কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল এই অঞ্চল এবং আশেপাশে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খানপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও নাকতলা বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে লাগাতার ৭২ ঘণ্টা ধর্ণার পর উদ্বাস্তুদের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রমের পর এই বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছিল। এর থেকেই উপলব্ধি করা যেতে পারে সংহতি কলোনি এমন একটি বিশেষ কলোনি যেটি প্রথম থেকেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

সংহতি কলোনির অপর প্রাণ পুরুষ এবং একজন কৃতী বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম কলোনির শিক্ষা ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন।[24] 'কেষ্ট' নামেই তিনি সকলের কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী একজন ছাত্র এবং পদার্থ বিজ্ঞানে এম এস সি পাশ করে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং 'সাহা ইনস্টিটিউট' এ অধ্যাপনার কাজে যুক্ত

[23] চঞ্চল মুখার্জী, [৬৮, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.০৯.২০২২।

[24] চঞ্চল মুখার্জী, [৬৮, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.০৯.২০২২।

হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। সারা ভারতে গবেষণার কাজে যুক্ত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। খুব অল্প দিনের গবেষণায় একটি সেচের পাম্প আবিষ্কার করেন যা গরীব কৃষকদের সেচের কাজের সহায়ক হয়েছিল। এছাড়াও তিনি অবদান রেখেছিলেন নানান আঞ্চলিক ক্লাব গঠনে, লাইব্রেরী নির্মাণে, উদ্বাস্তু আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। দীর্ঘদিন তিনি কলোনি কমিটির সভাপতিও ছিলেন।

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী, উদ্বাস্তু আন্দোলনের অগ্রনী কর্মী ও নেতা, কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজয় চ্যাটার্জী মহাশয় ছিলেন পূর্ববাংলার বরিশালের । ১৯৫২ সালে তিনি ২ নং ওয়ার্ডে ২/৩২ নম্বর প্লটে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং কলোনি গড়ার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন।[25] দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি ও ইউ সি আর সি'র সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলোনি কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বহুদিন যাবৎ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সন্মিলনীর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কলোনি নির্মাণ আন্দোলনের রাশ বিজয়গড় না সংহতি কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দুই প্রতিবেশী কলোনির মধ্যে দ্বন্ধ ছিল।

জবরদখল করে তৈরী হওয়া এই সংহতি উদ্বাস্তু কলোনি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে, সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন আদায় করেছিল। 'সংহতি কলোনি বাস্তুহারা সমিতি'র নেতৃত্ব তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে জমি অধিগ্রহণ করে জমির মালিকানা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সমিতির প্রথম সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ব্যানার্জী। অন্যান্য ব্যক্তিরা ছিলেন পিনাকি(চঞ্চল) মুখার্জী, দুলাল ব্যানার্জী এবং মানিক লাল নাথ।[26] প্রতিটি বাড়ি থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে কমিটিতে একটি ফান্ড নির্মাণ করা হয়েছিল। জমি দখলীকরণের স্বীকৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সরকারী অফিসে যাওয়া আসা করার ভাড়া, কমিটির পক্ষ থেকে যিনি যাবেন তাঁর জন্যে সারাদিনের খাবারের ব্যবস্থা করা এ সমস্ত নানা বিষয়ে যে খরচ হত তা সংগ্রহ করা হত ঐ ফান্ড থেকেই।

[25] পরিমল গুহ, [৭২, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.০৯.২০২২।

[26] চন্দ্রানী হালদার, [৫৩, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৫.০৯.২০২২।

বহু চেষ্টার পর সরকার একটি শর্তসাপেক্ষ দলিল প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল। এর প্রথম শর্ত ছিল যে এই জমিতে বসে কোনোরকমের সরকার বিরুদ্ধ মতামত প্রদান করা বা কাজ করা যাবে না।[27] কলোনির অধিবাসীরা নিঃশর্ত দলিল প্রদানের দাবী জানান। ১৯৮৪ সালে নিঃশর্ত দলিল প্রদানের কাজ শুরু হয়। বহু বিরোধিতা অতিক্রম করে সামান্য কিছু খাজনা প্রদানের মাধ্যমে 'ফ্রী হোল্ড টাইটেল ডিড' প্রদান করা হয়েছিল এই কলোনির উদ্বাস্তুদের।

এই কলোনিতে প্রথম থেকেই জল সরবরাহের অথবা পানীয় জলের ব্যাপক সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধানার্থে কলোনির উদ্বাস্তুরা রাজভবন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে মিছিল করেছিল যাতে ১৫ বছরের কিশোর থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধও যোগদান করেছিল।[28]

পৌরসভা দপ্তরে বারংবার দাবী জানানো হয়েছিল পানীয় জলের জন্য যথাযথ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করার। যেহেতু তাঁরা খাজনা বা কর প্রদান করেন না, সরকার জানায় এই ব্যবস্থা করা যাবে না। তৎকালীন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর মহাশয় সমগ্র অঞ্চলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর কর্পোরেশনকে বোঝায় যে উদ্বাস্তুদের এরূপ জীবনের জন্য দায়ী দেশের রাজনীতি, তাই তাদের সমস্যার সমাধানও সরকারকেই করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে কলোনির বাসিন্দাদের জন্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই কলোনিতে রাণীকুঠি অঞ্চলের রাণীদীঘি থেকে জল সরবরাহ করা হয়। এখানে ৬০% জল ও ৪০% রিজারভার রয়েছে। বহু ট্যাপ কলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমানে।[29] জল সরবরাহের ব্যবস্থা হলেও পয়ঃপ্রণালীর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বহু পরে প্রায় ১৯৭৮ এর সময়কালে সি এম ডি-এর তত্ত্বাবধানে পয়ঃপ্রণালী জল নিকাশীর ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল।

ক্লাব কালচার:

দুলাল ব্যানার্জী খুব অল্প বয়সেই উদ্বাস্তু আন্দোলন ও কলোনি গড়ার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও 'আদর্শ সংহতি ক্লাব' নির্মানের কাজেও তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। খেলাধূলা প্রসারে তাঁর যোগাযোগ ছিল বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনগুলির সাথে। প্রবল সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী হওয়ায়

[27] গৌতম সাহা, [৭২, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.০৯.২০২২।

[28] মিনু সাহা, [৪৮, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.০৯.২০২২।

[29] লক্ষী দাশগুপ্ত, [৪৬, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৭.০৯.২০২২।

খুব অল্পদিনেই অঞ্চলের সমস্ত কলোনি কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন 'দক্ষিণ কলকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সমিতি'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[30] কমিউনিস্ট মতাবলম্বী দুলাল মহাশয় ক্রমে 'ব্রাঞ্চ সম্পাদক'এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে জোনাল কমিটির সম্পাদক এবং কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। তিনি নেতাজী নগরের পার্টি অফিসে একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

এই কলোনির ইতিহাসে 'আর্দশ সংহতি ক্লাব' একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে আছে। আর্দশ পল্লী ১নং কলোনি ও সংহতি কলোনি ২ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী স্থানের উত্তরের ভিটেতে গড়া হয়েছিল ক্লাবঘর।[31]১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে, শ্রী শশাঙ্ক মুখার্জী মহাশয়, শ্রী বিজয় চ্যাটার্জীর তত্ত্বাবধানে ক্লাবের নামকরণ করে ক্লাব গড়ার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। বিজয় চ্যাটার্জীর বাড়ির বারান্দায় ১০-১২ জন সদস্য মিলে একটি মিটসেফ কিনে শুরু হয় ক্লাব গড়ার কাজ।[32] শশাঙ্ক মুখার্জী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। কলোনির প্রতিটি প্লটে মাটির ঘট দেওয়া হয়েছিল মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার জনয়। সপ্তাহান্তে তা সংগ্রহ করে গরীব পরিবারগুলিকে চাল, দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বই কিনে দিয়ে সাহায্য করা হত। ক্লাবের ঘর তৈরির উদ্দেশ্যে, কলোনির অধিবাসীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের কাছ থেকে দান চাওয়া হত। ১৯ পয়সার টিকিটের সিনেমা-শো নেতাজীনগর স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ক্লাবটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুনাম অর্জন করেছিল। নাটক, বিতর্কসভা, আবৃত্তি, গান-নাচ, মহা পুরুষের জন্মজয়ন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে 'আর্দশ সংহতি ক্লাব' অঞ্চলের বড় বড় ক্লাবের সাথে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এরও দু-তিন বছর পরে তরুন গুহ, ৩ নং ওয়ার্ডে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'উদয় সঙ্ঘ' ক্লাবটি এবং এরও অনেক পরে ১ নং ওয়ার্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়- 'নিউ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব', আর তারও অনেক পরে গড়ে ওঠে ৩ নং ওয়ার্ডে 'বিবেকানন্দ ক্রীড়া সংসদ' ক্লাবটি।

---

[30] রাজা বিশ্বাস [৫৭, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৭.০৯.২০২২।

[31] শশাঙ্ক মুখার্জী, [৭৩, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.০৯.২০২২।

[32] সমাপ্তি নাথ, [৫৩, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.০৯.২০২২।

দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে তৎকালীন সময়ে কিছু বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল বাঁশদ্রোণী এলাকায় 'জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি' এবং যাদবপুর অঞ্চলে 'বেঙ্গল ল্যাম্প' কারখানা ও উষা গেট, এখন যেখানে সাউথ সিটি মল দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে 'উষা পাখা' বা 'উষা ফ্যান' নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংহতি কলোনির বহু সংখ্যক উদ্বাস্তুরা এই সকল কারখানাগুলিতে কাজ শুরু করেছিলেন।

বর্তমান 'কলোনি কালচার' প্রাণোছ্বল। পরস্পরকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর বিপদে পাশে থাকা, অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে যোগদান করা এসব এখনও এই কলোনির একতাকে অটুট রেখেছে। টালি, বেড়া বা টিনের চালের ঘর আজ এখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। অধিকাংশ দ্বিতল বিশিষ্ট ঘর-বাড়ি এই অঞ্চলে দেখা যায়। তবে ফ্ল্যাটের সংখ্যা খুব সামান্য হওয়ায় বিজয়গড় বা আজাদগড়ের মতন এখানে 'ফ্ল্যাট কালচার' পুরোনো 'কলোনি কালচার'কে মুছে ফেলতে পারেনি। রায়পুর স্কুল, অজস্র সাজানো দোকান, জলাধার, বিবেকানন্দ পার্ক ইত্যাদি এই কলোনিকে আবৃত করে রেখেছে। উদ্বাস্তু পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম ডাক্তারি, শিক্ষকতা, ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার সাথে যুক্ত হয়েছেন।

২.৪ বিধান কলোনি ইউ বি (সন্তোষপুর)

সন্তোষপুর বিধান কলোনির উত্তরে গরফা, পূর্বে ইস্টার্ন পলিটান বাইপাস ও পশ্চিমে যাদবপুর এবং দক্ষিণে বাঘাযতীন দ্বারা পরিবেষ্টিত।

কলোনি নির্মাণ:

১৯৫০-১৯৬০এর দশকে, যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বদিক ধরে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা বাড়িঘর গড়ে তুলেছিলেন। সন্তোষপুর এভিনিউ অঞ্চলটি শুরু হয়েছিল রেলওয়ে স্টেশন পার হয়ে। যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা থাকার দরুণ সমগ্র ১৯৭০ এর দশকে এখানে প্রচুর বাসস্থান বা বসতি নির্মিত হয়। এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা কৃষিকার্য, ছোট ছোট দুগ্ধ প্রকল্প গড়ে তুলেছিল। বেশিরভাগ কাঁচা রাস্তা হলেও পরবর্তী সময়ে ঐ অঞ্চলের লোকেরা যৌথ প্রচেষ্টায় পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছিল খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে। বলাবাহুল্য, এই কলোনিটিতে কৃষিকার্যের জন্য যে ফাঁকা জমি রাখা হয়েছিল, তা দ্রুত ভর্তি হয়। জমির দাম সস্তা হওয়ায় মধ্যবিত্ত বাঙালী এই এলাকাটিতে আকৃষ্ট হয়।

কলোনিটি জলাজমি, পুকুর-খাল-হোগলা দ্বারা পরিবেষ্টিত জলাভূমি ছিল। উদ্বাস্তু আগমনের পূর্বে, প্রধানত কয়েকটি মুসলিম পরিবার এবং খুব অল্প সংখ্যক হিন্দু পরিবার এখানে বসবাস করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে রহিমা খাতুন নামে একজন মুসলিম মহিলা তার পরিবার নিয়ে এখানে থাকতেন। তাঁর বেশ কিছু খালি জমি ছিল যা তিনি পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কাছে খুব সামান্য পয়সায় বিক্রী করেছিলেন। নিজে সপরিবারে সন্তোষপুর ত্যাগ করে পার্কসার্কাস অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন।[33] ঘন-জঙ্গলময় জায়গাকে পরিষ্কার করে-জলাভূমির উপরেই কাঠ বিছিয়ে মেঝে তৈরী করে, উপরে বেড়া-টালি দিয়ে গড়ে উঠেছিল সন্তোষপুরের এই কলোনি অঞ্চল। এখানে সাপের উপদ্রব ছিল এবং বহু মানুষ সাপের কামড়ে প্রাণও হারিয়েছিলেন। রাত্রে সাপের কামড়ে কেউ মারা গেলে তার দেহ দাহ করা হত পরের দিন কারণ ঘন জঙ্গলে আবৃত পথ দিয়ে চলাচল করা ছিল অসম্ভব। পরবর্তী সময়ে, উদ্বাস্তুরা নিজ উদ্যোগে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য হাত মেলায়। একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক জনবসতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করে গিয়েছিল।

৮৫ বছরের একজন বৃদ্ধা তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছিলেন যে প্রথম দিকে এই বাস্তু অঞ্চলে জনবসতি ছিল হাতেগোনা। যে সামান্য কয়েককটি স্থানীয় মুসলিম ছিল তারা উদ্বাস্তুদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করেছিল ও বলপূর্বক লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল।[34] পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচতে এখানে আশ্রয় নিতে গিয়ে তারা পুনরায় আরেক দাঙ্গার মুখে পড়েন। আদি অধিবাসীদের মনে উদ্বাস্তুদের প্রতি ব্যপক ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল। এই অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা যখন নিজ উদ্যোগে কলোনি নির্মাণের কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন, তখন বিপরীত পক্ষ বাধার সৃষ্টি করে। উদ্বাস্তুরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই প্রবল বাধা-বিঘ্নের পেরিয়ে কলোনি নির্মাণ করেছিলেন।[35]

রাধাশ্যাম দাসের অভিজ্ঞতা অনেকটাই আলাদা।[36] তিনি সন্তোষপুর পুরোনো বটতলা অঞ্চলেই ১৯৫২ সালে, ২ বছরের একটি পুত্র সন্তান ও স্ত্রীসহ আসেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে

---

[33] রাধাশ্যাম দাশ, [৭৭, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.১০.২০২২।

[34] গোপাল দাশ, [৭৮, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.১০.২০২২।

[35] সুধারানী দাস, [৫৭, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.১০.২০২২।

[36] রাধাশ্যাম দাশ, [৭৭, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.১০.২০২২।

বসবাস করতেন কিন্তু আঞ্চলিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় নিজের সামান্য কিছু সহায়-সম্বল নিয়ে কলকাতায় নিজের এক আত্মীয়ের বাড়িতে চেতলা অঞ্চলে এসে উঠেছিলেন। তাঁর কথায় ঢাকাতে যে পাড়ায় থাকতেন সেটা ছিল মূলত হিন্দু পাড়া। পাশের পাড়ার মুসলিমদের সাথে তাঁদের আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই বহিরাগত কিছু মুসলিম যুবক সমগ্র অঞ্চলে একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করায়, পরিস্থিতি ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। এতে যদিও স্থানীয় মুসলিম ভাইদের কোনো যোগদান ছিল না বলে তিনি জানান।[37] উত্তাল পরিস্থিতিতে নিশিন্তে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ভয় ছিল প্রাণ ও সম্মান হারানোর। তাই দেশত্যাগ করাই সেই মুহূর্তে ঠিক মনে করেন। স্টীমারে করে ঢাকা শহরে এসে ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসেন এবং চেতলায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। তার অনেক পরে সরকার থেকে জমি দেওয়া হচ্ছে শুনে সন্তোষপুরের বিধান কলোনিতে খুব সামান্য পয়সায় সরকার প্রদেয় জমিতেই শুরু করলেন নতুন উদ্বাস্তু জীবন। জলা জায়গায় সাঁকো নির্মাণ করে যাতায়াত করতেন বলে তিনি জানান। এই উদ্বাস্তু জীবনের শুরুতে বিজয়গড় বাজারে এসে, হোগলা পাতা বিছিয়ে মাটিতে বসেই শুরু করেছিলেন মাছ বিক্রী। পরবর্তীকালে আঞ্চলিক আরেক উদ্বাস্তু বন্ধুর সাথে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে হাওড়া থেকে মাছ এনে দোকানে দোকানে মাছ দিতে শুরু করলেন, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুব কম সময়েই সন্তোষপুর অঞ্চলের একজন নামজাদা মাছ বিক্রীর হোলসেলার রূপে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন।

পেশায় মৎস্যজীবী সেদিনকার সেই যুবক রাধাশ্যাম মহাশয় আজকে ৯৬ বছরের বৃদ্ধ। শিক্ষার প্রতি বরাবর আগ্রহ থাকায় তিনি তাঁর দুই ছেলে এবং চার মেয়েকে স্কুলে, কলেজে পড়িয়েছেন। মাছ বিক্রেতা বলে অনেকেই তাঁকে নীচু নজরে দেখেছেন ও 'জেলে বাড়ির' নাম সেঁটে দিয়েছেন। তাই মন থেকে চাননি তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম মাছ বিক্রীকে জীবিকা রূপে নির্বাচন করুক। আজ তাঁর সন্তানরা সরকারী অফিসে উচ্চ পদে চাকরী করছেন। জীবন সংগ্রামের যে লড়াই তাঁকে লড়তে হয়েছিল তার যন্ত্রণা বা কষ্ট তিনি তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। তাই সন্তানদের নিজের জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে পরিচয় করাননি। শিক্ষা, প্রতিপত্তি, সম্মান- সব দিক দিয়েই তাঁর পরিবার আজ সমাজে ধনী ও প্রতিষ্ঠিত পরিবার। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারের শেষার্ধে তাঁর পূর্ববাংলার ভিটেতে ফিরে যাওয়ার সুপ্ত

[37] রাধাশ্যাম দাশ, [৭৭, সংহতি কলোনি, বাঘাযতীন, রায়পুর, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৭.১০.২০২২।

ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ভূমি পরিবর্তন, বাসস্থান পরিবর্তন, জীবন যাত্রা পরিবর্তন যেমন তাঁর জীবনের চরম সত্য ঠিক একইভাবে তিনি আজও নিজের পিতৃভূমি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গতেই বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত:

বর্তমানে সন্তোষপুর বিধান কলোনি সাজানো, সুন্দর এক নগরীতে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। সমগ্র অঞ্চল প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তাঘাট, একাধিক স্কুল- 'ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়', 'ঋষি অরবিন্দ বালক বিদ্যালয়', 'মডার্ন ল্যান্ড গার্লস স্কুল', 'বিদ্যা মন্দির স্কুল', এছাড়াও ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল আলোকিত করেছে। খেলাধূলার জন্য সুপরিকল্পিত খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র, বাৎসরিক দুর্গোৎসব, বাৎসরিক নাট্যৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ছোটদের জন্য নাচ, গান বা অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এই কলোনির প্রসিদ্ধ ক্লাবগুলি। বর্তমানে জমিতে বা পুরোনো বাড়ি ভেঙে রাস্তার দুপাশে বেশ কিছু বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মান করা হয়েছে। আঞ্চলিক জনপ্রিয়তা, নিকটস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধে, কাছাকাছি বড় বড় হাসপাতাল সন্তোষপুর অঞ্চলটিকে সকলের কাছে চাহিদাপূর্ণ করে তুলেছে। ফলতঃ এখানকার জমি বা ফ্ল্যাটের দাম অন্যান্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে হয়ে উঠেছা। এখানে বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম অধিক। সমস্ত অঞ্চলটি একটি হাই প্রোফাইল প্রতিষ্ঠিত ধনী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বিপণি বা মার্কেটিং জগতে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের দোকান এখানে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- টাইটান আই প্লাস, বাটা, ফ্লুরিস, বলরাম মল্লিক- রাধারমন মল্লিক, মিও আমোরে, সি সি ডি- এসবের কথা বলা যেতে পারে। এর থেকে এটা আমাদের কাছে অনেকটাই পরিস্কার যে, ১৯৪৬ বা ৪৭-এ যে সন্তোষপুর বিধান কলোনি গড়ে উঠেছিল আজ সেই কলোনিই দক্ষিণ কলকাতার ও দক্ষিণ শহরতলীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ও জনপ্রীয় উদ্বাস্তু কলোনি।

২.৫ কাটজুনগর কলোনি

কলোনির নির্মাণ:

কাটজুনগরের আরকপুর (J.L. ৩৯) এবং ইব্রাহিমপুর (J.L. ৩৬)-এর নির্মাণকাল ১৯৫০। এই কলোনিটি প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের দক্ষিণে এবং উষা কারখানা (বর্তমান সাউথ সিটি মল)

ও বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানার উত্তরে পূর্ব-পশ্চিম প্রসারিত ও ঝিল দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈন্য শিবির পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ এই পতিত জমিটি উদ্বাস্তুদের চোখে পড়ে। নিকটবর্তী যোধপুর আশ্রয় শিবিরের শম্ভু চৌধুরী এবং তৎকালীন বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানার কর্মী রঞ্জিত রায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি নির্মাণ করা হয় যারা এ জায়গা দখল করে কলোনি স্থাপন করে। বাঁশ, হোগলা দিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। দলের সদস্যদের মধ্যে বারংবার একাধিক নানা প্রসঙ্গে মতভেদের পর, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুর নামানুসারে এই জবরদখল কলোনির নাম দেওয়া হল 'কাটজু নগর'।[38] এমনটা বলা হয়েছিল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশাতেই রাজ্যপালের নাম অনুযায়ী কলোনির নাম করা হয়। কিন্তু একাধিক সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে জানা গিয়েছে যে কৈলাসনাথ কাটজুর নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর ফৌজের সেনাদের মুক্তিতে ভূমিকা ছিল। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও শরণার্থীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছিল। বহুক্ষেত্রে তিনি নিজে পুনর্বাসনের কাজ দেখতেন। এমনকি, পতিত জমি দখল করার পরামর্শ দিতেন কলোনির উদ্বাস্তুদের।

কলোনি কিভাবে এগোবে, কলোনির নানা কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হবে, এটা নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি উপযুক্ত কলোনি কমিটির। দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়ে প্রবল জটিলতা তৈরি হয় যার চূড়ান্ত ফল স্বরূপ কলোনি ভাগ হয়ে যায়। বর্তমান সাউথ সিটি মল থেকে বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানার সীমানা দেওয়াল বরাবর পূর্ব-পশ্চিম প্রসারিত রাস্তার দক্ষিণ অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে 'পোদ্দার নগর' যার দায়িত্বে ছিলেন শান্তিরঞ্জন দেব এবং শম্ভু চৌধুরী [39] এই কলোনির উত্থানে অংশীদার ছিলেন অম্বিকা চৌধুরী, অজিত বসু, অমল ভট্টাচার্য, সুরেশ ভাওয়াল, শান্তি দেব, সুজিত বসু, নিশিকান্ত গুহ, হিমাংশু রায়, নরেশ দাস প্রমুখ। বাকী অংশে গড়ে উঠল 'কাটজু নগর' কলোনি। কলোনিতে জায়গা পাওয়ার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ

- কলোনির প্রতিটি পরিবার কে তিন কাঠা করে জমি দেওয়া হবে।
- কলোনি কমিটির মেম্বারশিপ বাবদ ১৫ টাকা করে দিতে হবে।
- একটা ঘরের জন্য ধার্য হয় ৮০ টাকা।

[38] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়*, কলকাতা- গাঙচিল, ২০২৪, পৃ. ৩২।

[39] পাপিয়া সাহা [৪৭, কাটজুনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১১.২০২২।

- কলোনিতে ঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হবে কলোনি কমিটির তরফ থেকে।
- একই পরিবারে দু-তিন ভাই থাকলে তাদের একই জমিতেই মিলেমিশে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় কলোনি কমিটির পক্ষ থেকে।

কাটজুনগর 'কলোনি কমিটি'র গুরুত্ব সহকারে কয়েকটি বিষয়ে ভেবেছিল যেমনঃ

- কিভাবে কলোনি নির্মাণ হবে।
- জমি কিভাবে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে ভাগ সঠিকভাবে বন্টন করা হবে।
- কোন পরিবার কোন জমি পাবে এবং কতটা জমি পাবে।
- প্লট কিভাবে ভাগ করা হবে।
- তাদের দখল করা জমি যাতে কেউ পুনরায় দখল করতে না পারে তার জন্য রাতে পাহারা দিতে হত।
- কে, কখন , কোথায় পাহারা দেবে।

এই কমিটি পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিলেন শান্তি দেব, ভবতোষ দাস, অজিত বসু, বিমল ঘোষ প্রমুখ।[40] প্রথম দিকে এই কমিটির কোনো নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। পরে ঘর হলে ১৯৯০ সালে ভূপেন দে এর উদ্বোধন করেন। চিত্ত চৌধুরী ২৫ হাজার টাকা কমিটিকে দান করেন ঘর নির্মানের জন্য। কমিটির সম্পাদক ছিলেন পরিমল ভট্টাচার্য। কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কলোনির সকলের মধ্যে সুস্থভাবে প্লট বন্টন করা এবং সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত:

কাটজু নগর একটি সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধশালী উদ্বাস্তু কলোনি। একটি কলোনির শিক্ষা, বিদ্যালয়, ক্লাব, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত নানান আয়োজন, উৎসব, সমাবেশ এই সমস্ত কিছুই তার আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক মননশীলতার জানান দেয়। তাই আমরা আলোচ্য উদ্বাস্তু কলোনির এই সকল দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে কলোনি কমিটি কতগুলি বিশেষ বিষয়ে নজর দিয়েছিলঃ

[40] বাবলু ঘোষদস্তিদার [৫৭, কাটজুনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১১.২০২২।

- ২৩ ফুট এবং ১৬ ফুট বিশিষ্ট চারটি বড় রাস্তা এবং ৮ ফুট/৯ ফুটের মোট ৩৪ টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়।
- রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছিল, তা হল কলোনির প্রত্যেকের বাড়ির সামনে যেন অন্তত রিক্সা গাড়ি এসে দাঁড়াতে পারে।
- প্লটগুলি ছিল সুপরিকল্পিত এবং রাস্তাগুলি ছিল সুবিন্যস্ত।
- রাস্তা নির্মাণের কাজে কারখানার সিমেন্ট এবং ভারতীয় ও কৃষ্ণা গ্লাস কারখানার ঢালাইয়ের ছাই ব্যবহার হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু এই অঞ্চলে পুকুর ছিল, আর জমি নীচু ছিল, তাই বর্ষায় নিশ্চিতভাবে হাঁটু অবধি জল জমে যেত আর ঘরে ইঁট পাততে হত। ঘরের মধ্যেই মাছ, সাপ, ব্যাঙ এসে পড়ত তাই খাটের উপরেই চলত গোটা সংসার ও রান্নার কাজ। প্রবল বৃষ্টি হলে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাদের বাড়ি একটু উঁচু তাদের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হত। এই সমস্যার সমাধান করার জন্যে উষা কোম্পানী থেকে ছাই নিয়ে এসে রাস্তা উঁচু করার চেষ্টা করা হত। পরবর্তী সময়ে পুকুর সংস্কার করা হয়, মাটি কাটা হয়, পাড় বাঁধানো হয়। বহু চেষ্টার পর আন্ডার গ্রাউন্ড হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হয়। তবে পুকুরের জল জমে থাকার সমস্যা ছিল একথা যেমন সত্য, আবার এই পুকুরে রুই, কাতলা, মৌরলা, খলসে, ল্যাটা মাছ পাওয়া যেত। পুকুরের জল কাঁচের মতন স্বচ্ছ হওয়ায় তা পানীয় জল হিসেবেই ব্যবহার করেছেন উদ্বাস্তুরা। কলোনিতে প্রথম পানীয় জলের নলকূপ বসান হয় ১৯৫১ সালে।[41]

শিক্ষা:

উদ্বাস্তু সমাজ বুঝতে পেরেছিল যে একমাত্র শিক্ষার আলোই পারবে তাদের জীবনের অন্ধকারকে কিছুটা হলেও দূর করতে। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে, চাকরি বা অন্যান্য যোগ্য পেশায় যুক্ত হতে একমাত্র প্রয়োজন ছিল শিক্ষা গ্রহণের। পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও পারস্পারিক সহযোগিতা, ভালোবাসা, বিশ্বাসের সঙ্গে একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে তারা একের পর এক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র- ছাত্রী যোগাড় করা হয়েছে।

[41]গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২৪, পৃ. ৪৭।

১৯৫০ এর দশকে নির্মিত হয়- 'কাটজু নগর স্কুল', 'কাটজু নগর স্বণময়ী বিদ্যাপীঠ', 'কাটজু নগর বিদ্যাপীঠ', 'কাটজুনগর জুনিয়ার হাই স্কুল'। স্কুলের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্কুলে শিক্ষকতা করা – এই সমস্ত কিছুই কলোনির ভিতরের উদ্বাস্তু বাসিন্দারাই করত। স্থানীয় বা আদি অধিবাসীদের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। যাঁদের ছাড়া শিক্ষার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হত না তাঁরা হলেন নির্মলা দত্ত, রাসমোহন দত্ত, অবলাকান্ত দাশ, শরৎ কুমার চক্রবর্তী, প্রাণশঙ্কর সাহা, গীতাঞ্জলী সাহা, নীলা বোস, স্বপ্না সরকার, উপেন সরকার, ভবতোষ তপাদার, সরোজরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। বর্তমান যাদবপুর ৮বি এলাকার জনপ্রিয় দোকান 'হিন্দুস্থান সুইটস'-এর মালিক রবীন পাল মহাশয় কাটজুনগরের বাসিন্দা। তিনি কলোনির স্কুল নির্মাণের জন্যে দশ হাজার টাকা দান করেন ।[42] তাঁর মা 'স্বর্ণময়ীর' নাম অনুসারে বিদ্যালয়ের নাম রাখা হল 'কাটজুনগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠ'।

খেলাধূলা:

কলোনি গড়ার কাজ যেমন এগিয়েছে, তার সাথে সাথে কলোনিতে যে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তানরা ছিল তাদের জীবনে স্বাভাবিক ছন্দ টিকিয়ে রাখার জন্য খেলাধূলার দিকটি নিয়েও ভাবা হয়। ১৯৫০ সালে কাটজু নগর স্কুলের পশ্চিম প্রান্তে একটা বিরাট ঘর এবং তার লাগোয়া মাঠ খেলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।[43] ভলিবল, বাস্কেট বল, ব্যায়াম, সাঁতার, দাড়িয়াবান্ধা'র মতন খেলা হত। এই সময়ে আরেকটি মাঠও বেশ পরিচিতি অর্জন করে যার নাম 'মরা কাটা মাঠ'। ফুটবল ও ভলিবল উভয় ক্ষেত্রেই বেশ সুনাম অর্জন করেছিল এই কলোনির ছেলেরা। এই খেলার মূল তত্ত্বাবধানে ছিল 'জাগৃতি সঙ্ঘ'। ওয়ার্ড লিগ খেলা এই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উচ্চতা অনুযায়ী দলের সদস্য নির্বাচন করা হত। খেলাকে ভিত্তি করে প্রতিটি ওয়ার্ডের মধ্যে একটা মর্যাদার লড়াই চলত। এই কলোনির এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম উঠে আসে, যাঁরা পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর জগতে প্রসিদ্ধ হন। এঁদের মধ্যে নির্মল চক্রবর্তী, অসিত বন্দোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। কাটজু নগরের বিশাল পুকুর সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার হয়। এই সময়ে কয়েকজন সাঁতারু বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যেমন প্রদীপ রায়, মনীশ চক্রবর্তী। এঁরা জাতীয় স্তরে খেলার সুবাদে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি পান।[44] পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও

[42] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়*, কলকাতা- গাঙচিল, ২০২৪, পৃ. ৫০-৫১।

[43] বেনু হালদার, [৬৭, কাটজুনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১১.২০২২।

[44] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়*, কলকাতা- গাঙচিল, ২০২৪, পৃ. ৫৬।

এই সময়ে নানান দিকে নিজেদের উৎকর্ষতার ছাপ রেখেছিলেন। শেফালি চক্রবর্তী ১৯৬৮ এ বাংলার প্রথম পর্বতারোহী রূপে নাম করেন। তাই এটা বলা যেতে পারে কাটজু নগর কলোনির উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েরা কঠিন সময়েও নিজেদের উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মন্দির ও পূজা-পার্বন:

উদ্বাস্তু সংস্কৃতির মনন-যাপনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে পূজা-পার্বন বা ধর্মীয় আচার- আচারণ। উদ্বাস্তুরা যেখানেই গিয়েছেন সঙ্গে করে বহন করেছেন তাঁদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে ও নির্ভরশীলতাকে। আর এর জন্যেই মন্দির স্থাপন কিংবা পূজাপার্বনের সংস্কৃতিকে তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। এই কলোনিটিও এক্ষেত্রে পৃথক নয়। ১৯৫০ সালে কলোনির ভিতরে একটি কালী মন্দির গড়ে তোলা হয়। কলোনির প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় নিশিকান্ত গুহ মহাশয়ের সম্পাদনায়। কলোনির বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে পূজার যাবতীয় কাজ করতেন। হ্যাজাকের আলো, বাঁশ বা টিনের বেড়া, প্রতিমা- এই নিয়েই পূজার আয়োজন করা হত। এই পূজাকে কেন্দ্র করে অধিবাসীদের উন্মাদনা বা উল্লাসের কোনো শেষ ছিল না। সকলে একযোগে আনন্দ উৎসব পালন করতেন।[45] পূজা শেষে বিজয়া দশমীর দিনে বড়দের প্রণাম করে, বাড়িতে বানানো নিমকি, গজা, নাড়ু সংগ্রহ করা ছিল ছোট মেয়েদের কাছে এক আনন্দের দিন। এছাড়াও, উষা, বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানায় বড় করে বিশ্বকর্মা পূজা হত। বাড়িতে বাড়িতে হরির লুট দেওয়ার প্রচলন ছিল।

সংস্কৃতি:

সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে এই কলোনির অধিবাসীদের গর্ব ছিল। নাটক, কবিতা পাঠ, নাচ গান এসমস্ত কিছুই তাদের আগ্রহের বিষয় ছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে কাটজু নগরের প্রান্তরে একের পর এক নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, বৈকুণ্ঠের খাতা, ডাকঘর। এই কলোনির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহনকারী রূপে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষক মহাশয় উপেন সরকার, হিমাংশু রায়, অরুণ রায়, সুরেশ তপাদার, নির্মলা দত্ত প্রমুখ। এই কলোনিতে মেয়েদের জন্যেও একটি ক্লাব নির্মিত হয়-‘ উদিতা সংঘ’। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বাণী ভট্টাচার্য ও শুক্লা দেব।

[45] কৃষ্ণ পদ সরকার, [৬৭, কাটজুনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১১.২০২২।

এই কলোনিতে প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল ১৯৫১ সালে দক্ষ গায়ক হেমন্ত বিশ্বাসের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান। তিনি গানের পাশাপাশি বাংলা সিনেমাতে যেমন অভিনয় করেছেন আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিকা ও ওষুধ বিতরণের কাজও করেছেন। নাটকের প্রতি আগ্রহের জন্য একের পর এক নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছ এই কলোনির বুকে। প্রতি বছর কলোনির প্রতিষ্ঠা দিবসেও তাঁরা নাটকের আয়োজন করতেন। প্রথম নাটক 'বেজায় রগড়'-এ নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন পুরুষেরা- রাম কৃষ্ণ ফৌজদার, সুনীল চক্রবর্তী, রাজেন দে। আরেকটি নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল- 'বাস্তুভিটা'। এতে অভিনয় করেছিলেন প্রাণশঙ্কর সাহা, পিন্টু তপাদার। পরিচালনায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শক্তি সেন। তিনি ছিলেন গণনাট্য আন্দোলনের একজন পরিচিত ব্যক্তি। নাটক পরিচালনার পাশাপাশি-বাংলা সিনেমাতে রূপসজ্জার কাজেও তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল সুন্দর কবিতা পাঠের গুণ। ১৯৯৫ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা সন্মানিত হন।[46] অজিত গুহ-র পরিচালনায় 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন পিন্টু তপাদার, গণেশ দত্ত, প্রাণশঙ্কর সাহা প্রমুখ। তাদের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এইভাবে একের পর এক নাটক এই কলোনিকে একটি পৃথক পরিচিতি প্রদান করেছিল। সনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবেশ চক্রবর্তীও এই কলোনির গর্ব। 'এপিক থিয়েটার' নামে একটি নিজেস্ব নাট্য দল তিনি গঠন করেন।

সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী চট্টগ্রামের রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া ছিলেন 'বড়ুয়ার দোকান'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নিপুন রন্ধনশিল্পী। পোদ্দারনগরের সকল বিশিষ্টজনের আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ আঁখড়া ও মিলনস্থল ছিল এই দোকান।[47] এই দোকানের ঘুঘনি, আলুরদম, ওমলেট, চা কলোনির এবং কলোনির বাইরের লোকেদের কাছে ছিল প্রসিদ্ধ।

২.৬ পোদ্দারনগর কলোনি

কাটজুনগর কলোনির একেবারে লাগোয়া পোদ্দারনগর কলোনি। পূর্বে যাদবপুর গার্লস স্কুল, পশ্চিমে বিক্রমগড়, দক্ষিণে গলফ গ্রিন এবং উত্তরে বিক্রমগড় মাঝখানে এই কলোনি। এই উদ্বাস্তু কলোনিকে কাটজুনগরের 'যমজ কলোনি' বলা হয়।

---

[46] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়*, কলকাতা, গাঙচিল,২০২৪,পৃ. ৫৮-৫৯।

[47] বিজন ভট্টাচার্য, [৭৭, কাটজুনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১১.২০২২।

কলোনির উৎপত্তি:

১৯৫০ সালের ২৮শে জানুয়ারি পোদ্দারনগর কলোনির প্রতিষ্ঠা দিবস। কাটজুনগর কলোনির উত্তর অংশ বিচ্ছিন্ন করে এই কলোনির নির্মাণ হয়। এই অংশের জমির মালিক আনন্দিলাল পোদ্দারের নাম অনুসারে এই কলোনির নামকরণ করা হয়।[48] যদিও পরবর্তী সময়ে নতুন করে এই কলোনির নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয় 'মন্মথনগর' কিন্তু বিরোধিতা হওয়ায় নাম পরিবর্তন হয়নি। পরিকাঠামোর দিক থেকে এই কলোনি ছিল উন্নত। এই অঞ্চল বেষ্টিত ছিল অজস্র মিলিটারি ক্যাম্পে। তাই অনেক আগের থেকেই এই কলোনিতে পাকা রাস্তা এবং বাঁধানো নর্দমা ছিল। পোদ্দারনগর কলোনির মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শম্ভু চৌধুরীর নাম করা যেতে পারে। বাস্তবে তিনি যদিও যোধপুর ক্যাম্প নিবাসী ছিলেন কিন্তু এই কলোনির নির্মাণে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। এই কলোনিতে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, চাঁদপুর অঞ্চলের। এই কলোনির নির্মাণে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে পুষ্প দত্ত রায়, বিনয় ব্যানার্জি, প্রাণতোষ নাগ, গোপাল রায়, নলিনী চক্রবর্তী, চিত্ত রায়চৌধুরী, জীবন ঘোষাল, শঙ্কর রায়, অতীন দাশ প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। মাত্র ৭৩টি উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে এই কলোনি নির্মিত হয়। টালিগঞ্জ পৌরসভার ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত করা হয় এই কলোনিকে। এর পৌর প্রতিনিধি ছিলেন ডাক্তার অরবিন্দ দাশগুপ্ত।[49] বর্তমানে এটি কলকাতা কর্পোরেশনের ৯৩ ওয়ার্ড।

কলোনি কমিটির সদস্যরা ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষদস্তিদার, শৈলেন দত্ত রায়, ধীরেন রায়, হীরেন দাশ, তরুনী দাশ, প্রমোদ সেন প্রমুখ। ১৯৫৫ তে প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীশ চন্দ্র রায়। প্রভাতী সংঘের ঘরেই কমিটির যাবতীয় কাজ হত। ২০০০ সালে এর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। পরিতোষ রায়, বাদল বিশ্বাস প্রমুখের উৎসাহে 'পোদ্দার নগর প্রাইমারি স্কুলে'-র ঘরেই কলোনি কমিটির কাজ নতুনভাবে শুরু হয়।[50] বর্তমান সময়েও এর অস্তিত্ব রয়েছে।

শিক্ষা:

পোদ্দার নগর কলোনিতে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বাকী কলোনিগুলির মতন করেই। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হলেও বর্তমানে এর অস্তিত্ব প্রায় নেই

[48] সোনালী গুহ [৫৭, পোদ্দারনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ৯.১২.২০২২।

[49] চন্দনা সাহা [৫৯, পোদ্দারনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ৯.১২.২০২২।

[50] ক্ষেন্তি সাহা, [৫৯, পোদ্দারনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ৯.১২.২০২২।

বললেই চলে। পোদ্দারনগর প্রাইমারি স্কুল নির্মিত হয় ১৯৫০ সালের শেষ দিকে। কলোনির অধিবাসীদের পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই স্কুল চলত। 'মুষ্টিভিক্ষা'র মাধ্যমে চাঁদা সংগ্রহ করা হত। প্রত্যেক বাড়িতে মাটির হাঁড়িতে এক মুঠ করে চাল রাখতে হত। সেই চাল প্রতি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে বিক্রি করা হত এবং সেই টাকা স্কুলের কাজে লাগানো হত। প্রথম দিকে বিনা পয়সায় শিক্ষাদান করা হলেও পরবর্তী সময়ে আট আনা মাইনে নির্ধারণ হয়, যা পরে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ আনা।[51] স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন যোগেন ভৌমিক। এছাড়াও যারা একেবারে বিনা পয়সায় শিক্ষাদান করেছেন তাদের মধ্যে নিলীমা সাহা, নির্মলা দত্ত, হরিপদ বসু প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

১৯৬৫ সালে কাটজু নগর স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের সরকারি অনুমোদনের আসে প্রাণশঙ্কর সাহা, সুনীল চক্রবর্তী, ভবতোষ তপাদার, সুভাষ ভাওয়ালের চেষ্টায়। কিন্তু ১৯৮০ এর দশকে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কমতে শুরু করে দক্ষ শিক্ষকেরা অন্যান্য স্কুলে বদলির ফলে। এই সময়ে বিমল চ্যাটার্জি স্কুলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্কুল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। তার উদ্যোগে এই স্কুল সরকারি দপ্তর থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছিল। ২০০৪ সালে এই স্কুল প্রায় বন্ধই হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, প্রাণতোষ নাগ এবং গোপাল রায়ের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে ২ নম্বর পোদ্দার নগরে 'শিশুমেলা' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়। এই স্কুল ১৯৬৩ সালে সরকারি অনুমোদন পায়। এই স্কুল আজও জনপ্রিয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্কুল ছিল 'পোদ্দারনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়' যেখানে মেয়েদের সংখ্যা ছিল অধিক। ১৯৬৫ সালে এ মেয়েদের আলাদা স্কুল নির্মিত হয় যার প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন প্রতিমা সরকার।[52] এছাড়াও অমীয়া চক্রবর্তী, রীণা সেনগুপ্তের নামও পাওয়া যায় যারা এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। বহুকাল প্রায় বন্ধের মতন করেই টিকে ছিল এই স্কুল। বর্তমানে পুনরায় নতুন করে এই স্কুল শুরু হয়েছে।

ক্লাব কালচার:

[51] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়,* কলকাতা- গাংচিল,২০২৪,পৃ ৭৬-৭৭

[52] রাজু সাহা, [৬৯, পোদ্দারনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ৯.১২.২০২২।

পোদ্দার নগরবাসীরা কলোনির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আঞ্চলিক স্তরে ক্লাব গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা শুরু করে। 'প্রভাতী সংঘ' গড়ে ওঠে ১৯৫০ সালের ২৮শে জানুয়ারি।[53] উল্লেখ্য, এই ক্লাবের নাম প্রথমে ছিল 'আবর্ত্তন সংঘ', যা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'প্রভাতী সংঘ'। বেড়া, টিন দিয়েই হয় এর নির্মাণ। বর্তমানে যে পুকুরের সামনে দিয়ে আমরা সাউথ সিটি মলের দিকে যাই, সেই পুকুরের ঠিক পাশেই তিন তলা বাড়িটিই এই 'প্রভাতী সংঘ'। বেড়ার ঘর, টালির চালার সেই ক্লাবের বর্তমান রূপ অবাক করার মতোই। ক্লাবের সদস্যদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা এবং একতাই এই ক্লাবের বর্তমান রূপ নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। কলোনি কমিটির উন্নয়নের কাজ এখানে করা হত। পুলিন তপাদার, সৌমেন্দু পাল, অরুণ চৌধুরী, মানিক পাল ছিলেন ক্লাবের দায়িত্বে। নানান ধরণের সামাজিক কাজের পাশাপাশি, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলার আয়োজন করা হত এই ক্লাবের তরফ থেকে। তবে, ফুটবল খেলায় এর নাম বেশ পরিচিতি পায়।

এই সংঘের আরেকটি বিষয় ছিল লক্ষণীয় যেমন এদের পাঠাগার। পঙ্কজ বিহারী পাল মহাশয় ছিলেন এই পাঠাগারের প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ১৯৫৪ সালেই তিনি পাঠাগারিক হিসেবে নিযুক্ত হন।[54] কিন্তু ১৯৭০ এর সময়কালে এই পাঠাগার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে বইয়ের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে। পাঠকের সংখ্যা কম হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল কাছের 'জাগৃতি সংঘ'-র বিরাট পাঠাগার। 'প্রভাতী' নামে তাদের নিজেস্ব পত্রিকা বের হত যার দায়িত্বে ছিলেন প্রণব চ্যাটার্জি। বর্তমান ক্লাবের সম্পাদক সনৎ দাস। আজও প্রতিদিন ক্লাবের ভিতরে ক্যারাম ও তাসের প্রতিযোগিতা হয়। নানান উৎসব অনুষ্ঠানে ক্লাব ভাড়া দেওয়া হয়। ক্লাবের প্রতিটি সদস্যদের আইডেনটিটি কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.৭ বিবেকনগর কলোনি

বর্তমান যাদবপুর রেল গেট সংলগ্ন পাল বাজার অঞ্চলের কিছু দূরেই বিবেকনগর কলোনি। এর ঝিল পাড়, কালী মন্দিরের মাঠ, দুটি সুপরিচিত স্কুল- 'যাদবপুর নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন' এবং 'আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন'-এর জন্যই এই অঞ্চল আজও প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত।

নির্মাণকাল:

[53] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দার নগর, বিক্রমগড়,* কলকাতা, গাঙচিল,২০২৪, পৃ. ৮০-৮১।

[54] রাজু সাহা, [৬৯, পোদ্দারনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ৯.১২.২০২২।

১৯৫০এর দশকে নির্মিত হয় এই উদ্বাস্তু কলোনি। ডোবা কচুরীপানা, সাপ-ব্যাং এর উপদ্রবের মাঝেই এই কলোনি গড়ে ওঠে। এর নির্মাণে আশুতোষ ভট্টাচার্য, দুলাল বন্দোপাধায়ের নাম করা যেতে পারে।[55] এই কলোনির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য নির্ভর করতে হয়েছে মৌখিক সাক্ষাৎকারের উপর। যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা হলেন চন্দন নাগ, সুধীর রঞ্জন রায়, শুভঙ্কর দত্তগুপ্ত, কুঞ্জ বিহারী নাথ, আত্রেয়ী সেনগুপ্ত, মনিলাল সরকার, চন্দন নাগ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্যামল দত্ত, প্রীতম নাথ, গোপা হালদার, প্রীতিলতা সেনগুপ্ত, নগেন্দ্র দেবনাথ, সোনালী মুখার্জী, অজন্তা সেন, দীপঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক ভৌমিক , রচনা রায়, স্বরূপ গাঙ্গুলী।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

বিবেক নগর কলোনির সাথে গৌরান্বিত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এখানকার 'নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন' এবং 'আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন'- দুটি পৃথক স্কুল হলেও সূচনালগ্নে এই দুটি একটিই স্কুল ছিল। সূচনালগ্নে যুক্ত ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রিয়বালা দত্ত, রুক্মিনী সরকার, বামাচরণ চক্রবর্তী প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছেলেদের জন্য 'যাদবপুর নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন' নির্দিষ্ট হয়। সেই সময়ে এর উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী।[56] ১৯৫০ সালের, ২রা মার্চ একটি খোলা মাঠে, টিনের চালের তলায়, ঐ ১৩ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হয় এই স্কুলের পথ চলা।

গঙ্গাদাস পাল মহাশয় নিজ উদ্যোগে স্কুল গড়ার জন্য পাঁচ বিঘা জমি এবং এককালীন নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে এই স্কুল গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালে এই স্কুল মাধ্যমিক পর্ষদের অনুমোদন পায় এবং ১৯৬১ সালে দশম ও স্কুল ফাইনালের অনুমোদন পায়। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে গঙ্গাদাস পাল মহাশয়ের পিতার নাম অনুসারে এই স্কুলের নাম দেওয়া হয় 'যাদবপুর নব কৃষ্ণ পাল আদর্শ বিদ্যালয়'। ১৯৭৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এটি দ্বাদশ শ্রেণি হয়। ১৯৮০ সালে অবৈতনিক হয় দশম শ্রেণি অবধি। ১৯৮২ সালে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি এটি অবৈতনিক স্কুলে পরিণত হয়। বেড়ার ক্লাসঘর এবং একটি হাত পাখা, একটি বোর্ড এই নিয়ে যে স্কুলে শিক্ষকরা তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করে দিতেন। শিক্ষকদের মধ্যে ননী সেন, পঞ্চানন চক্রবর্তী, ইশান চট্টরাজ, পবিত্র ভট্টাচার্য, প্রাণ গোপাল নাথ, সুরেন্দ্র লাল চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতি বছর স্কুলের একটি নিজেস্ব

[55] শুভঙ্কর দত্তগুপ্ত, [৬৯, বিবেকনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১২.২০২২।

[56] বিবেকনগর ক্লাবের সুভেনিয়র, ২০০০

ম্যাগাজিন বের হয় যার নাম 'ছাত্রধারা' যা ছিল ছাত্র ও শিক্ষকের মনের দর্পন। আজ এই স্কুল মস্ত বড় চার তলা ইমারত।

১৯৫১ সালে, ১৩ নম্বর ঝিল রোডে এই স্কুল নির্মিত হল শুধুমাত্র মেয়েদের 'আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন' স্কুলটি তৈরি হয়। সকলের প্রিয় 'ইংরেজির দিদিমণি বীণাদি' ছিলেন ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষিকা। বিপ্লবী বীণা দাস নিজের লেখনী 'শৃঙ্খল ঝংকার' এ তাঁর সশস্ত্র বিপ্লবের কথা লেখা আছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দেশপ্রেমে উৎসাহ যোগানো মাস্টারমশাই বেণীমাধব দাসের সুযোগ্য কন্যা ছিলেন তিনি। বর্তমানে এই স্কুল ৭৫ বছর পূর্ণ করলো ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা সমাদৃত। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুমা চট্টরাজ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত। এখনকার প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়বালা দত্ত ও তার সুযোগ্য সহকর্মীদের ভালোবাসা, অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য, স্নেহ, মায়া মমতায় এই বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যামন্দিরে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য শিক্ষিকারা হলেন শ্রীমতি আভা, মঞ্জুশ্রী দত্ত শ্রীমতি সুদীপা, সোনালি মুখার্জী প্রমুখ। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এই স্কুল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপচার্য ত্রিগুণা সেনের সহায়তায় এই বিদ্যালয় নব কলেবর ধারণ করে। টিনের চালা থেকে এই স্কুল একটি ত্রিতল ইমারতে পরিণত হয়।

বিবেক নগরের আরো একটি প্রাথমিক স্কুল 'শিশু শিক্ষা নিকেতন' এবং ' বিবেকনগর পাঠাগার' একটি পাবলিক লাইব্রেরী।

১৯৯০এর দশকে বিবেকনগর টাউন লাইব্রেরী নির্মিত হয়। এটি ২৮ এ, ঝিল রোডে অবস্থিত। সাহিত্য, নাটক, ইতিহাস, কৌতুক, সমস্ত বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৬৭০০। উচ্চ মাণের পরিষেবা এখানে দেওয়া হয় যাতে পাঠকেরা আগ্রহ পায়।

অন্যদিকে, ধর্মীয় চর্চার এক জীবন্ত উদাহরণ 'বিবেকনগর কালী মন্দির' । এই মন্দিরে কালী মূর্তির পাশাপাশি অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তিও রয়েছে। প্রতি বছর ১ লা বৈশাখে এই মন্দির সংলগ্ন মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। এলাকার মানুষজনের কাছে এই মন্দির ও মন্দির প্রাঙ্গন এক শান্তির ও ভরসার জায়গা।

উদ্বাস্তু এই কলোনিকে আরেকটু ভালো করে বোঝার জন্য কয়েকটি সাক্ষাৎকার তুলে ধরা প্রয়োজন।

সুধীররঞ্জন রায় এর বয়স ৮৭ বছর। পূর্ববাংলার কুমিল্লা জেলায় ছিল তাঁর বাসভূমি। ১৯৫২ সালে পিতার সঙ্গে দেশত্যাগ করেন। প্রথমে গেঁদে, সেখান থেকে রাণাঘাট, তারপর কলকাতার বিবেকনগরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। তৎকালীন কলোনি কমিটির সদস্য ছিলেন পরিমল ব্যানার্জী, সঞ্জয় চক্রবর্তী। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সিটি কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাউন্ট ও অডিট ডিপার্টমেন্টে কর্মরত হন 'একাউন্টেন্ট জেনারেল' পদে। দেশবিভাজনের সময় চোখের সামনে কাছের জনের হত্যার নির্মম দৃশ্য। তারপরেই তারা দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।[57]

তার বিবরণ থেকে উঠে আসে একাধিক তথ্য। এই অঞ্চল ছিল মূলত মুসলমানদের। তারা অন্যত্র চলে গেলে এখানে তাদের বসতি গড়ে ওঠে। এখানে যখন আসেন তখন প্রচুর পাতকুয়াতে মানব কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালে এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ আসে। পায়রা ওড়ানোর লড়াই, ফুটবলের লড়াই ছিল তখন জনপ্রিয়। হ্যাজাকের লাইটে এবং মা-মাসিদের বাড়ি থেকে আনা কাপড় দিয়ে ছাউনি তৈরি করে রবীন্দ্রজয়ন্তীর নাটক হত। 'বিবেক নগর ক্লাব', 'শিশুরবি ক্লাব', 'ফ্রেন্ডস ক্লাব', 'প্রতাপ সংঘ', 'যুবসম্প্রদায়', 'নবঐক্য ক্লাব', 'অগ্রদূত সংঘ', 'সংস্কৃতি চক্র'-ছিল সুপরিচিত। এই কলোনির মহিলাদের 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথম দুর্গাপুজো হয় ১১০ টাকার চাঁদা তুলে।

২.৮ কামালগাজি লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি

রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা, থানা সোনারপুর এবং পোস্টঅফিস কামালগাজির অন্তর্গত একটি বহু পুরোনো উদ্বাস্তু কলোনি লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি। এটি সরকার দ্বারা নির্মিত কলোনি।

দেশবিভাজনের পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুর অভিজ্ঞতাকে আমি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা হলেন নির্মল দাস, মঞ্জু সাহা, অরুণা রায়, পরেশ বণিক, মানিক নাথ, অনির্বান গুহ, অরুন বিশ্বাস, নবলক্ষী সাহা, মধুসূদন রায়, সমীর রায়, সৌমিত্র ভট্টাচার্য, অহিন্দ্র চ্যাটার্জি, ধীমান সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা মন্ডল। আঞ্চলিক কোনো

[57] সুধীররঞ্জন রায় [৮৭, বিবেকনগর কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১৯.১২.২০২২।

প্রতিবেদন বা সুভেনিয়র কিংবা এই কলোনি প্রসঙ্গে কোনো লিখিত তথ্য না থাকায়, শুধুমাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে একটি মৌখিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছি।

নির্মল ভট্টাচার্য-র বয়স ৮৬ বছর। বরিশাল জেলার, পিরোজপুর সাবডিভিশনের অন্তর্গত কদমতলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী, দুই ছেলে, এক অবিবাহিত মেয়ে, ছেলাদের দুই স্ত্রী, একজন নাতি এবং একজন নাতনি। বর্তমান কামালগাজি লস্করপুর পেয়রাবাগানে দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা বাড়ি। ১৯৬৯ সালে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। প্রতিবেশী, পারিবারিক আত্মীয়বর্গ দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে, তিনিও তাদের সাথে এদিকে চলে আসেন। প্রথমে ট্রেনে করে বাগদা, সেখান থেকে বনগাঁ, তারপর শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে কামালগাজি লস্করপুর পেয়েরাবাগানে আসেন নিজ আত্মীয়ের আস্তানায়।[58] এই অঞ্চল বা কলোনিকে নির্বাচন করেছিলেন কারণ আগের থেকেই নিজ আত্মীয়রা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। পরিচিত বর্গে মধ্যে থাকাটাই নিরাপদ আশ্রয় হবে বলে মনে করেছিলেন। তাঁর দাদা এবং তাঁর স্ত্রী ১৯৫৮ এর সময়কালেই অভিবাসিত হয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিলেন। সরকার থেকে কোনো পুনর্বাসন এঁরা পাননি। স্থানীয় জমি ছিল মুসলমানদের জমি। তাঁরা অন্যত্র চলে যাওয়ায়, তাঁদের কাছে নূন্যতম মূল্য ৩০০০ টাকার বিনিময়ে জমি বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছিলেম। সেই জমিতেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন।

এখনও বহু মুসলমান পরিবার এখানে রয়েছে। তবে অভিবাসনপর্বে অধিকাংশ মুসলমান তাঁদের জমি উদ্বাস্তুদের কাছে বিক্রি করে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলেন। সেই জায়গাগুলিতেই উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন হয়। সরকার থেকে এক্ষেত্রে কোনো বাধা আসেনি। বরং জমি কিনতে, ঘর নির্মাণ করতে সরকার প্রয়োজনে লোন প্রদান করেছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে। কিন্তু স্থানীয় আদি অধিবাসী যারা ছিল তারা এই উদ্বাস্তুদের ভালো চোখে দেখেনি। তাঁদেরকে ডাকা হত ‘বাঙাল ভূত’ বলে। আঞ্চলিক কোনো সহায়তা তারা পাননি কলোনি নির্মাণে বা বসতি স্থাপনে। যদিও পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়।

নির্মলবাবু পূর্ববাংলায় থাকাকালিন ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। আরো পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অভিবাসনের বাস্তবতা তাঁর সেই ইচ্ছেপূরণের সুযোগ কেড়ে নেয়।

[58] নির্মল ভট্টাচার্য [৫৭, কামালগাজি লস্করপুর পেয়েরাবাগান কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২৩.১২.২০২২।

পড়াশোনা করে, সরকারি চাকরি করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল অধিক এবং রোজগার করার লোক ছিল মাত্র একজন তাঁর দাদা। তাই সেই মুহূর্তে পরিবারের অন্ন সংস্থানের চিন্তা করাই তাঁর কাছে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সংসারের অভাবের তাড়নায় তাৎক্ষনিক পরিস্থিতিতে যে কাজ পেয়েছেন, তাই করেছেন। মাথায় করে সব্জী বিক্রি করেছেন, বর্তমানে গড়িয়া বাজারে তাঁদের ফলের ও সব্জীর দোকান।

বর্তমান সময়ে, তিনি জানান কলোনি কালচার প্রায় অবলুপ্ত। কারণ হিসেবে তিনি প্রমোটারদের দৌরাত্মের কথা বলেছেন। এখন ফ্ল্যাট ও আবাসন নির্মাণের ব্যবসা। তাঁদের সময়ে বাড়ির দরজা সারাদিন খোলা রাখতেন। সকলে এসে নিজেদের কথা বলতেন, অন্যদের কথা শুনতেন, কেউ বিপদে পড়লে তাকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে সেটা ভাবাই ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো চোর, ডাকাতির ভয় ছিল না। একে অপরের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিলেন। পারস্পারিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা, একতা- এই নিয়েই প্রবল অভাবের দিনেও তাঁরা জীবন কে উপভোগ করেছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। সকলে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। কলোনির এই বদলে যাওয়া পরিবেশ তাঁকে বার বার ব্যথিত করেছে।

কলকাতার শহরতলীর কয়েকটি কলোনির সাথে কলকাতা থেকে দূরে বিখ্যাত উদ্বাস্তু ক্যাম্প যেমন কুপার্স ক্যাম্প তা নিয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এদের পারস্পারিক পার্থক্য নির্ধারণ করা, অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্র কতটা আলাদা তা বোঝা।

২.৯ কুপার্স ক্যাম্প:

কুপার্স ক্যাম্প হল পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহত্তম ক্যাম্প। এর নির্মাণকাল ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ। ৬.৫ বর্গ কিলো মিটারের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এই অঞ্চলটি নির্মিত হয়েছে।[59] অর্থাৎ প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তুর স্থান সঙ্কুলান এখানে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মে মাসে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩ লক্ষ। আবার পরবর্তীকালে তা কমে দাঁড়ায় ৭০ হাজারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের যে ঘাঁটিগুলি ছিল লোহা ও টিন দিয়ে নির্মিত। সেখানে আশ্রয় নেয় উদ্বাস্তুরা। এছাড়াও কাঠ ও টিন দিয়ে মাথা গোঁজার স্থান নির্মিত হয়। এই রকম প্রতিটি ছাউনিতে, গুদামে প্রায় ১৫ থেকে ২৫ টি পরিবারকে জায়গা দেওয়া হয়। ৫০ ফুটের একটি ঘরে বা কক্ষে চারটি থেকে

[59] Extract from File 1164-44 Genl., IB, File number. 191/46, WBSA

পাঁচটি পরিবারের জায়গা হয়। একটি গোডাউনে ৪০ থেকে ১০০ টি পরিবার মাথা গোঁজে। ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন, গৌড় কুন্ডু তার একটি বইতে লেখেন- প্রতিটি পরিবারের জন্যে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫ বর্গফুট পর্যন্ত জায়গা। 'স্বাধীনতা' নামক পত্রিকায়, 'Cooper's camp refugee shelter or concentration camp?'- এই শিরোনামে একটি আর্টিক্যেল লেখেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে টিনের স্যুটকেস দিয়ে নিজেদের জায়গা বা সীমানা তারা নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য তথ্যে বলা হয়েছে প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ স্থান ছিল- ৫ ফুট গুণ ৬ ফুট অথবা ৩০ বর্গফুট। [60]

১৯৫২ সালে ঝড়ের সময়ে কুপার্স ক্যাম্পের ৩০০ টি কুড়ে ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সময়ে তৎকালিন নেতা ছিলেন জ্যোতিষ মুখার্জি এবং বিমল বিশ্বাস। তাৎপর্যপূর্ণভাবে একজন ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং অপরজন ছিলেন নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিনিধি। তাঁরা বিনা টিকিটে, ট্রেনে করে কলকাতায় আসেন। মুখ্যমন্ত্রী ও রিলিফ কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁদেরকে আটক করা হয় এবং ফিরে যেতে বলা হয়। ক্যাম্পের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা এবং জল সরবরাহের সমস্যা। কুপার্স ক্যাম্পের প্রায় ৭০ হাজার উদ্বাস্তুর জন্যে মাত্র ২০ টি টিউবওয়েল ছিল। এই ক্যাম্প ছিল চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর ও অপরিষ্কার। ১৯৬৫ সালের ২৯ শে মার্চের 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এই কুপার্স ক্যাম্পের বিভৎসতার চিত্র ফুটে ওঠে। ক্যাম্পের প্রসাবখানাগুলি ছিল ভাঙাচোরা, মল-মূত্রে ভরা। প্রাত্যহিক পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। তার সাথে ছিল মশার উপদ্রব। বেশ কিছু পরিবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। চিকেন পক্সও বৃদ্ধ পায়, সাথে বৃদ্ধি পায় কলেরার মতন রোগও। [61]যেহেতু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

তৎকালীন সরকারি অফিশিয়াল রেকর্ড অনুযায়ী, সেই সময়ের প্রতিটি ক্যাম্পে উপযুক্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৎকালীন উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী রেনুকা রায় তাঁর সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে প্রতিটি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের জন্যে যথাযথ ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে একটি করে হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।

[60] Extract from File 1164-44 Genl., IB, File number. 191/46, WBSA

[61] Sekhar Bandyopadhyay & Anasua Basu Ray Chaudhury, Caste & Partition in Bengal: The Story of Dalit Regugees 1946-1961, Oxford University Press, UK, 2022, 79

কুপার্স ক্যাম্পে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ একই সময়েই ধুবুলিয়া ও চাঁদমারি ক্যাম্পে দুটি হাসপাতাল ছিল- বিশেষ করে টি বি রোগের জন্যে। রোগীদের জন্যে ১৫০ টি বেডের ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছিল। অন্যদিকে মনোরঞ্জন ব্যাপারির একটি লেখাতে উদ্বাস্তুদে চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বলা হয় এই সময়ে ডাক্তাররা দুটি আলাদা আলাদা রঙের তরল ঔষদ চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতেন। একটা সাদা তরল আরেকটি লাল তরল। ঠান্ডা, জ্বর, মাথাব্যথা, পেট ব্যথা, টাইফয়েড, যক্ষা, কলেরা এবং জন্ডিসের মতন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সাদা তরলটি জলে গুলে ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন, প্রতিদিন তিনবার করে। অন্যদিকে, কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া- এ সব ক্ষেত্রে লাল রঙের তরল ঔষধটির ব্যবহার করা হত- প্রতিদিন দুইবার করে।[62] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছোট ছোট ক্যাম্প , যেমন- খুমরা ক্যাম্পে সপ্তাহে দুবার করে 'মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট' এর ব্যবস্থা করার কথাও জানা যায়। এই ছোট ক্যাম্পগুলির অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। কিন্তু এমনটা অভিযোগ জানিয়েছিলেন ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা যে যখন ডাক্তাররা তাঁদেরকে দেখার জন্যে আসতেন তখন তাঁদের কাছে কোনো যথাযথ ও পর্যাপ্ত ঔষধ থাকতো না, একমাত্র ডেটলের বোতল ছাড়া। এই সকল কারণে কোনোভাবেই যথাযথ চিকিৎসা উদ্বাস্তুরা পেতেন না, তাই ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৫২ এর জুন থেক জুলাই মাসের মধ্যবর্তী সময়ে, ধুবুলিয়া ক্যাম্পে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার ৩৫৭ জন উদ্বাস্তু, যাঁদের মধ্যে ৬৩১ জন মারা গিয়েছিলেন।[63] এই রকম ঘটনা আরো অন্যান্য ক্যাম্প গুলিতেও চোখে পড়ে। বর্ধমানের জোগেশ্বর দিহি ট্রানজিট ক্যাম্পে, অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মতন ঘটনা ঘটার অনেক পরে ডাক্তার এসেছিলেন। একমাত্র সাদা ট্যাবলেট এবং লাল টনিক রোগ নিরাময় করে, রোগীদের মৃত্য আটকাতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদিকে জলের অভাব, খাদ্যের অভাব, নিম্ন মানের রেশন, পচে যাওয়া চাল, পানীয় জলের অভাব, মূল-মূত্র ত্যাগ করার পর্যাপ্ত জায়গার অভাব- এ সমস্ত কিছু একাধিক রোগের জন্ম দিয়েছিল। মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আবার অন্যদিকে সময়মত সঠিক চিকিৎসার অভাবেও একের পর এক মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মৃত্যুর মতন ঘটনা ঘটলেও তা অনেক সময়েই উদ্বাস্তুরা চেপে যেতেন ডোল হারানোর ভয়ে। কুপার্স ক্যাম্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগের কারণে প্রচুর শিশুর মৃত্যু হলেও তা সরকার পক্ষকে জানানো হয়নি। খবর গোপন রেখে, বাচ্চাকে মাটির

[62] Ibid., 80-81
[63] Ibid., 83

নীচে চাপা দিয়ে দেওয়া হত কিংবা গভীর জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। সরকার পক্ষ থেকে দেহ সৎকার করার জন্য ১৬ টাকা করে দেওয়া হত এই সময়ে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, সব দিক দিয়ে দুর্দশা ও খারাপ পরিস্থিতি ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের জীবন কে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য হলেও আশার আলো দেখা গিয়েছিল। যেমন- ক্যাম্পের উদ্বাস্তু শিশুদের জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে দলিত শিশুদেরও একসাথে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। একটা চক আর দুটো বই এই দিয়ে শুরু হয়েছিল পঠন-পাঠন। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল দুটো বই ও একজন শিক্ষক। উদ্বাস্তু শিশুরা এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিল যা তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে পাথেয় হয়। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই একই ঘটনা ঘটেনি, তাই আমরা বলতে পারি একদিকে যেমন কোনো কোনো ক্যাম্পের শিশুরা শিক্ষার আলোর সন্ধান করতে পেরেছিল আবার অনেকেই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি কুপার্স ক্যাম্পের মতন বড় বড় ক্যাম্পগুলিতে, কিছু কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন- পোস্ট অফিস, পুলিশ পোস্ট, রেল প্ল্যাটফর্ম- যাতে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি উস্বাস্তুরা কুপার্স ক্যাম্পে যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ছবি চোখে পড়ে এই সময়কার অন্যান্য করেকটি ক্যাম্পে। এক্ষেত্রে গয়েশপুর ক্যাম্পের কথা বলা যেতে পারে।

কাঁচরাপাড়া স্টেশন অঞ্চলে এবং কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে, আমেরিকান সেনাবাহিনীর ছাউনিতে গড়ে ওঠে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প। ২০ হাজার জন উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে ৮ হাজার ছাউনি নির্মিত হয়। পরিকল্পনা করা হয় দুটি বাজার, একটা উচ্চ মাধ্যমিক ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল এবং ১৩ টি প্রাথমিক স্কুলের। ৪০ টি পরিবারের জন্যে পায়খানা ও একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়। তবে এখানে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলেও লাভজনক জীবিকার পরিকাঠামো এখানে একেবারেই ছিল না। অন্যদিকে একজন বাঙাল, আবার দলিত উদ্বাস্তুর পক্ষে আঞ্চলিক স্তরে কাজ পাওয়া কোনোভাবেই সহজ ছিল না। দলিত লেখক যতীন বালার উল্লেখে করেছেন যে তিনি দীর্ঘ দিন শিশু শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিছু কিছু ব্যক্তিরা চায়ের দোকান দিলেও অধিকাংশরাই সরকারি ডোলের উপরেই ভরসা করে থাকতেন, যতক্ষণ না ডোল বন্ধ হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে কিন্তু কাজ করার, রোজগার করার তেমন তাগিদ দেখা যেত না। অন্যদিকে শহরে ক্যাম্প- কলোনিতে যারা বসবাস করতেন , তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই ক্যাম্প

বা কলোনির বাইরে গিয়ে কাজ খোঁজার বা রোজগার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। শহরাঞ্চলের ক্যাম্পে বসবাস করা উদ্বাস্তু এবং শহরাঞ্চলের থেকে দূরবর্তী স্থানের ক্যাম্পে বসবাসরত উদ্বাস্তুদের মধ্যে মন ও মানসিকতায়- যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ক্যাম্পের উদ্বাস্তু জীবনে, জাতি, বর্ণ বিভেদ প্রাসঙ্গিক। ১৯৫০ সালে, গৌরাঙ্গ দাস- যিনি কুপার্স ক্যাম্পের একজন বাসিন্দা এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি তাঁর কিছু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে জাতিগত প্রশ্নে ক্যাম্পের তাৎক্ষণিক চিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে জায়গা ছিল সীমিত ও সীমাবদ্ধ। তাই সকল জাতির বা শ্রেণির উদ্বাস্তুরা এক ঘরে থেকেছে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী একসাথে জীবন কাটিয়েছে। একটা বৃহৎ জায়গাতে একইসাথে একত্রে রাতে ঘুমিয়েছে। একই রান্নার জায়গাতে, একইসাথে রান্না করেছে- মলমূত্র ত্যাগ করেছে। একই জায়গায়, একইসাথে লাইনে দাঁড়িয়েছে কখনো জল সংগ্রহের জন্য আবার কখনো সরকারি ডোল ও রেশন সংগ্রহের জন্য। তাদের সেই জীবনে কোনো ব্যক্তিগত-গোপনীয়তা মেনে চলার কোনো প্রশ্ন বা সুযোগ ছিল না।[64] একটা বিরাট হল ঘরে একেকটা পরিবার তার নিজের জায়গা অন্য আরেকটি পরিবার থেকে আলাদা করার জন্যে পাথর বা কাঠের টুকরো ব্যবহার করেছে মার্কাররূপে। [65]আবার শাড়ি দিয়ে বা অন্যান্য কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন নিজেদের জায়গা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার জন্যে মনে রাখা প্রয়োজন, এঁদের প্রত্যেকেরই কিন্তু পূর্ব বাংলায় নিজ নিজ বাসস্থান ও জমি ছিল। কিন্তু ক্যাম্পের মধ্যে তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মাত্র ৫ বর্গফুট জায়গা যেখানে একটা গোটা উদ্বাস্তু পরিবার - পিতা, মাতা, সন্তান- সন্ততি নিয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ একই জায়গাতেই আবার রান্না করা, খাওয়া-দাওয়া করা, সন্তান প্রসব করার কাজও হয়েছে, আবার একই স্থানে মৃত্যুও হয়েছে। অর্থাৎ একজন মানুষ- অভিবাসিত হয়ে ক্যাম্পের উদ্বাস্তু জীবন শুরু করে জীবনের নানা বাঁকে, নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেখানেই নিজের জীবন যাত্রার পরিসমাপ্তি করেছেন।

ক্যাম্পে চুরি, ডাকাতি, মারামারি প্রাত্যহিক ঘটনাতে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে দীর্ঘদিন এক জায়গায় অনেক লোকেরা থাকায়- পুরুষদের মধ্যে স্ত্রীকে মারধরের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্যাম্পের মহিলাদের জীবন একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।[66] ১৯৫২ সালে, এই কুপার্স ক্যাম্পে

[64] Ibid., 102

[65] Ibid., 111

[66] Sekhar Bandyopadhyay & Anasua Basu Ray Chaudhury, p. 202

বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের যৌন জীবন নিয়ে সমীক্ষা করেন খগেন্দ্রনাথ সেন এবং ললিত সেন। তাদের এই সমীক্ষা থেকে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। ক্যাম্পের বাসস্থানের অভাব, আব্রু রক্ষা করতে না পারার গ্লানি, চূড়ান্ত আর্থিক দূরাবস্থা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভাব ইত্যাদি কারণে ক্যাম্পবাসীদের যৌন জীবনে পরিবর্তন আসে। অবৈধ সম্পর্ক ও পতিতা বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন ক্যাম্পবাসী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় গোপনে গর্ভপাত বেড়ে গিয়েছিল মহিলাদের মধ্যে। অনেক মহিলাদের আবার অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। লজ্জা-ঘৃণা, মান-সম্মান ত্যাগ করে একপ্রকারের জন্তুর ন্যায় জীবনে এরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।[67] অনেক সময়েই ক্যাম্পের মহিলারা পুরুষদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছিল এক জোট হয়ে। ক্যাম্পের বাইয়েও সমাজের ভদ্রলোক শ্রেণির পুরুষেরা বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পের মহিলাদের সাথে লুকিয়ে সম্পর্ক রাখতেন। ইতিহাস ও সমসাময়িক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বারংবার মহিলাদের যৌন নির্যাতন যে ক্যাম্পের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাতে পরিণত হয়েছিল তা ব্যক্ত করে। এই সমস্ত বিষয়গুলির জন্য ক্যাম্পে বসবাসকারী নিম্ন শ্রেণির উদ্বাস্তুদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ক্যাম্পের নিরাপত্তার অভাব, হিংসা- এই সকল বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলতে চায়নি। ক্যাম্পের জীবনে 'কাস্ট' বা 'জাতি'র কোনো জায়গা ছিল না। বাস্তব উপেক্ষা করে দেবযানী সেনগুপ্ত তাঁর লেখাতে বলছেন যে একটা সামাজিক রূপান্তর ঘটেছিল দেশভাগের মধ্যে দিয়ে এবং ক্যাম্পের জীবনে সকলে সমান হয়ে গিয়েছিল সবার একটাই পরিচয় যে তাঁরা প্রত্যেকেই উদ্বাস্তু।[68] তাঁদের কাছে ঐ ক্যাম্পের জীবনেও জাতি, বর্ণ এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই অধিকাংশ উদ্বাস্তু এমন ক্যাম্পে যেতে পছন্দ করতেন যেখানে তাঁরা তাঁদের পরিচিত আত্মীয় বর্গের সান্নিধ্যে আসতে পারবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধুবুলিয়া, বাগজোলা, কুপার্স ক্যাম্পের প্রায় ৭০ ভাগ ছিল নমঃশুদ্র। কিছু সংখ্যক উচ্চ জাতির হিন্দু উদ্বাস্তুরা যাঁরা ক্যাম্পে ছিলেন তাঁরা কিন্তু আলাদা থাকতেই অধিক পছন্দ করতেন। তাই 'উদ্বাস্তু' পরিচিতির অন্তরালেও কিন্তু জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরিভাবে ভুলে যাওয়া হয়নি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা কুপার্স ক্যাম্প সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। কিন্তু সমগ্র বিষয়টির আভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গে অবহিত হওয়ার জন্য আমি বর্তমান কুপার্স ক্যাম্পে বসবাসকারী

---

[67] Ibid., p. 203-204

[68] Debjani Sengupta, *The Partition of Bengal: Fragile Borders and New Identities*, Cambridge University Press, p. 34

অধিবাসীদের উপর একটি সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে আমি এখানে একটি অধিবাসীর বয়ান তুলে ধরছি।

পরিচিতি:

বর্তমান কুপার্স ক্যাম্পের অধিবাসী স্বপন দাস, তিনি তৃতীয় প্রজন্মের সন্তান হলেও তাঁর আগের প্রজন্মরা দীর্ঘদিন ধরে (১৯৫০) এই কুপার্স ক্যাম্পের বাসিন্দা এবং দেশবিভাজনকালে অভিবাসিত হয়েছেন। স্বপন দাস মহাশয় বর্তমান কুপার্স ক্যাম্প মাগুরখালি অঞ্চলের বাসিন্দা। বারোজন সদস্য নিয়ে তাঁর পরিবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি তপশীলি জাতির অন্তর্গত এবং এই ক্যাম্পের প্রায় ৯0% পরিবারই নিম্ন জাতির।

পিতা বাংলাদেশে ফার্মাসির কাজে যুক্ত ছিলেন। অভিবাসনের পর ক্যাম্পে এসে- রাজমিস্তির কাজ করেন। স্বপন বাবু ও তার প্রথম জীবনে একজন রাজমিস্ত্রির কাজ করেতেন। কিন্তু তিনি বর্তমান পেশায় কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী।

পূর্ববাংলায় বরিশাল অন্তর্গত, গ্রাম-রায়পুরা, জেলা পটুয়াখালি, কলাপাড়া, বর্তমানে এখানে তাদের যাতায়াত আছে এবং তাঁর দাদা এই ঠিকানায় আজও রয়েছেন। সবাই এদেশে আসেননি। স্বপন দাস মহাশয়ের কথার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে নানান প্রসঙ্গ- ভয়, আতঙ্ক থেকে দেশত্যাগ করে, তার পিতা প্রথমে লঞ্চ, তারপর ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসা এবং সেখান থেকে প্রথমে তালদি এবং তারপর রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে।[69]

ক্যাম্পে থাকাকালীন, সরকার পক্ষ থেকে চাল, গম ২৫ থেকে ৩০ টাকা ক্যাশ ডোল দেওয়া হয়েছিল এবং জমিও দিয়েছিল কিন্তু তা অনেক পরে। সরকার থেকে প্রতিটি পরিবারকে কাঠ আর টিন দিয়ে ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকে বিরাট বিরাট টিনের ছাউনির তলায় তাদের জীবন কেটেছে। একসাথে অনেকগুলি পরিবার মিলে বসবাস করেছিল। ক্যাম্পের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম টিউবওয়েল ও পায়খানার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তা নিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিত্য দিন ঝগড়া-মারামারি লেগে থাকত।

[69] স্বপন দাস [৬৭, কুপার্স ক্যাম্প]। সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২৩.১২.২০২২।

তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। স্ত্রী পড়েন নি। বর্তমানে তার ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তার সাথে ব্যবসায় যোগ দিয়েছে। তার মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভিন্ন রাজ্যে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী।

তার বয়ানে ক্যাম্প:

প্রতিটি ক্যাম্প কতগুলি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল, আর প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে সুপারেন্টডেন থাকত, যার দায়িত্ব ছিল সমগ্র ক্যাম্পটি পরিচালনা করা। মহিলাদের ক্যাম্পেও মহিলা দের নিয়োগ করা হত। মহিলারা কিছু ক্ষেত্রে দয়াবান হলেও, পুরুষরা ছিলেন যথেষ্ট নির্মম। সরকারি চাকরি থেকে যারা অবসর নিতেন, তারা আবার এই ক্যাম্পগুলিতে কাজে যোগ দিতেন। অভাবের তাড়নার ক্যাম্পের যুবকরা চুরি, ডাকাতির সঙ্গে ও নানা প্রকার কু কাজে নিজেদের যুক্ত করেছিল। তার ভাষায়, 'কুপার্স ক্যাম্পের গুন্ডাদের তান্ডবে রাতে মেয়েরা ঘর থেকে বেরত না'। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে, তারা 'কুপার্সের গুন্ডা', 'কুপার্সের মস্তান' এই সকল নামে পরিচিত হত।[70] তিনি বলেছেন কোনো সরকার তাদের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর মতন কোনো ব্যবস্থা করে দেয়নি। কেবলমাত্র সাময়িক পরিত্রাণের জন্য সামান্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি জানান, ক্ষমতায় আসার আগে বামফ্রন্ট সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেনি। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উঠে আসে – কোনো সরকারই চাইতো না এই ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা ঘুরে দাঁড়াক। সরকার চেয়েছিল ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা যাতে সব সময় সরকারের উপর প্রতি ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে সংখ্যায় অল্প হলেও, যারা পড়াশোনা শিখেছিলেন। তারা গোপনে ক্যাম্প ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। ক্যাম্পের দমবন্ধ করা জীবন, প্রতিদিন গুন্ডাদের আক্রমণ এরকম পরিবেশে অনেকেই থাকতে চায় নি।

২.১০ কলোনি ও ক্যাম্প প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

উদ্বাস্তু কলোনির ইতিহাস একটি বৃহৎ আলোচনার ক্ষেত্র। এই কারণে আমি আলোচ্য অধ্যায়ে দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি কলোনি নিয়ে আলোচনা করেছি যে কলোনিগুলি নিয়ে খুব কম ভাবা হয়েছে। অন্যদিকে আমি কলকাতা শহর থেকে দূরে কুপার্স ক্যাম্প নিয়েও আলোচনা করেছি।

[70] স্বপন দাস [৬৭, কুপার্স ক্যাম্প]। সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২৩.১২.২০২২।

এই ক্যাম্পে যে উদ্বাস্তু বসতি গড়ে উঠেছিল- সেই প্রসঙ্গে বা ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তু জীবনের সাথেও পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করেছি। এই আলোচনাতে কলোনি এবং ক্যাম্পের উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে, আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি যা উভয়ের মধ্যেকার কিছু পার্থক্য বা তুলনা কে নির্ধারণ করে। পার্থক্য বা তুলনাগুলি নিম্নরূপ-

- কলকাতাতে যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি অধিকাংশই জবরদখল কলোনি অর্থাৎ জোর করে বা বল পূর্বক জমি দখল করে কলোনি নির্মাণ। অন্যদিকে, ক্যাম্পগুলি নির্মিত হয়েছিল সরকার দ্বারা। এক্ষেত্রে সরকার বা তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ নির্ধারণ করেছে কোন উদ্বাস্তু বা উদ্বাস্তু পরিবারকে কোন ক্যাম্পে পাঠানো হবে।
- কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনিগুলি তে যে উদ্বাস্তুরা বসতি নির্মাণ করেছিল, তারা প্রধাণত দেশবিভাজনের কিছু আগে বা দেশবিভাজনের একেবারে প্রথম দিকেই এসেছিল। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৫১- এই সালগুলিতে এদের অভিবাসন ছিল অধিক। অন্যদিকে, ক্যাম্পের যে উদ্বাস্তুরা ছিল তারা দেশবিভাজনের বেশ কিছ সময় পর পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। ১৯৫৫- ১৯৬০ এর দশকে এদের অধিক সংখ্যায় অভিবাসন হয়েছে।
- কলকাতা কলোনির উদ্বাস্তুরা অধিকাংশ ছিল শিক্ষিত, উচ্চ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির। অন্যদিকে, ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা ছিল প্রধাণত কম পড়াশোনা জানা, দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্গত, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্যই ছিল।
- কলোনির উদ্বাস্তুরা অধিকাংশ শিক্ষিত হওয়ায় তারা উদ্বাস্তু বসতি স্থাপনের সাথে সাথে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ভেবেছে। একদিকে যেমন নিজ বসতি বা স্থান দখলের জন্য লড়াই করেছে আবার অন্যদিকে খুব দ্রুত চেষ্টা করেছে শিক্ষা সম্প্রসারণে। নূন্যতম প্রাথমিক শিক্ষা যেন প্রতিটি উদ্বাস্তু শিশু পায় সেটা তাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল । আর এই কারণেই কলোনির মধ্যে একের পর এক স্কুল নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে, ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের লড়াইটা ছিল একেবারে অন্য রকম। তাদেরকে লড়তে হয়েছিল পুনর্বাসনের জন্য। ক্যাম্পে কিভাবে থাকবে, কোথায় থাকবে, কতদিন থাকবে তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য। আবার এমনও অনেকেই ছিল যারা কিন্তু কোনো পুনর্বাসন না পেয়ে সারাজীবন ক্যাম্পেই থেকে গিয়েছিল।

তাই তাদের কাছে প্রশ্ন ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত ঠাঁইয়ের। এই রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষা কিংবা সংস্কৃতি নিয়ে ভাবার মতন সময় তারা প্রথম দিকে পায়নি।

- মহিলা সমাজকে কেন্দ্র করেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকে যায়। কলোনির মহিলারা কলোনি নির্মাণে তাদের পুরুষ সঙ্গীদের সাথে পথে নেমে যেমন লড়াই করেছে, আবার সংসারের প্রয়োজনে কাজ করেছে। স্কুলে পড়ানো , সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে কাজ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, হাসপাতালের নার্স ইত্যাদি। শহুরে পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে তারা যেমন নিজেদের কথা বলার ধরণে পরিবর্তন এনেছিল। আবার খুব দ্রুত আটপৌড়ে শাড়ি পড়ার ধরণ বদলে, কুচি ও প্লিট দিয়ে শাড়ি পড়ার কায়দাও রপ্ত করেছিল। নিজেরা যেমন পরেছে, আবার অন্যকেও পরিয়েছে। তাদের বদল ছিল শুধু অবয়বে নয় বরং মানসিকতাতেও। অন্যদিকে ক্যাম্পের মহিলাদের লড়াইটা ছিল একেবারে ভিন্ন। তারা লড়াই করেছিল ত্রাণ, ডোলের জন্য, পুনর্বাসনের জন্য, ক্যাম্পে যাতে ডাক্তারি পরিসেবা পাওয়া যায় তার জন্য। দীর্ঘদিন, একসাথে বহুজনের মধ্যে, বহু সমাগমের মধ্যে থাকায় এবং অভাবের কারণে বহু কম বয়সী উদ্বাস্তু মহিলারা বিপথে চালিত হয় যাদের হদিশ পাওয়া যায়নি। যদিও এর মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম ছিল যাদের লড়াই করার মনের জোর ছিল অধিক। একের পর এক ক্যাম্পের মহিলারা এক হয়ে, নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্পের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ করার জন্য লড়াই করে গিয়েছিল। লড়াই ক্যাম্পের মহিলারা যেমন করেছিল আবার কলোনির মহিলারাও করেছিল শুধুমাত্র তাদের লড়াই করার ধরণ ও ক্ষেত্রে ছিল আলাদা।

আলোচনার শেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন- অভিবাসনের পরেও যে নানান ক্ষেত্রে বিভাজনের রাজনীতি, উঁচু- নীচের হিসেব নিকাশ, সমান-অসমানের বিভেদ যে বর্তমান ছিল তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। উল্লেখ্য যেহেতু কলোনি নির্মাণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষা সংস্কৃতি, তাই আমি কলোনির নানান স্কুল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বিভাজন দেখা গিয়েছিল। যেমন এমন বহু উদ্বাস্তু স্কুল ছিল যেগুলিকে বলা হত ‘কলোনির স্কুল’, ‘উদ্বাস্তুদের স্কুল’। একটা ‘ক্লাস ডিফারেন্স’ থেকে গিয়েছিল বলেই কলকাতার আদি অধিবাসীরা কিন্তু সবসময় এই ‘কলোনির উদ্বাস্তু’ ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতনা। সেই সময়ে বা তার বহু পরেও ‘ইংলিশ মিডিয়াম’এ পড়া ছেলেমেদের ‘ উদ্বাস্তু’ বা ‘বাংলা

মিডিয়ামে'র স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া হতনা। সময় এগিয়েছে, বর্তমান পরস্থিতিও বদলে গিয়েছে কিন্তু একটা চাপা উন্নাসিকতা থেকে কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে আজও বেরোতে পারিনি। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের কলকাতার আদি অধিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্কের রসায়ন কে বুঝতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমি আমার পরবর্তী অধ্যায় নির্মাণের চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

কলকাতা শহরতলির উদ্বাস্তু জীবন এবং সাংস্কৃতিক রূপায়ণ: পূর্ববর্তী অধিবাসী ও উদ্বাস্তু সম্পর্ক

১৯৪৭ এ দেশ বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ থেকে যে 'উদ্বাস্তু' মানুষগুলি পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল সেটাই এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষের বাসস্থান পরিবর্তন ও জীবনধারা পরিবর্তন দুইয়ের মধ্যে একটা নিবিড় পারস্পারিক সম্পর্ক আছে।[1] সেখানেও একটা সম্পর্কের বুনন চলে প্রতিনিয়ত। জন্মের সময় থেকে একজন মানুষ শুধুমাত্র তার পরিবারকেই চিনতে শেখে না, তার পরিচয় ঘটে তার চারপাশের জগতের সাথেও। সেখানকার জল, গাছপালা, নদ-নদী প্রকৃতি এ সমস্ত কিছুর সাথেও মানুষের এক পরম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন মানুষের রুচিবোধ, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক গঠন এ সমস্ত কিছুই সে সর্বপ্রথম তার চারপাশের পরিচিত জগৎ থেকেই আহরণ করে। তাই যখন একজন মানুষ তার বাসস্থান পরিবর্তন করে তখন সে বাধ্য হয় পুরোনো ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, চালচলন, আদবকায়দা এবং রীতিনীতি বদলে ফেলতে। ঠিক এমনই সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল উদ্বাস্তু সমাজ ও সংস্কৃতিকে। উদ্বাস্তু সমাজে কীভাবে এবং কোনপথে এই পরিবর্তনের বা সম্পর্কের নির্মাণ-বিনির্মাণের খেলা চলেছে এবং চলছে সেটাই আলোচনা সাপেক্ষ।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে যেকোনো আলোচনায় প্রবেশ করার সময় কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে। জমির জবরদখল এবং তা বাঁচাবার নিরন্তর লড়াই, উপনিবেশ, উদ্বাস্তু কলোনি, বাঁশ, চাটাই, টালি, ভাঙা ঘর, খোলা মাঠে অসম্পূর্ণ বাজার, মেয়েদের প্রাণ ও মান বাঁচানোর লড়াই, পারিবারিক ঐতিহ্য ও চেনা পরিসর ছেড়ে চাকরির অনুসন্ধান, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক- পরিচ্ছদ, ভাষাগত ভিন্নতার জন্য উপহাসের পাত্র হওয়া ইত্যাদি।[2]

---

[1] ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মন্ডল, পৌলমী ঘোষাল সম্পাদিত, *ধ্বংস ও নির্মাণ: বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, কলকাতা: সেরিবান, ২০০৭, পৃ. ৪।

সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, '১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে পৃথিবীর মানচিত্রে দুটি নতুন রাষ্ট্র স্বাধীন বলে চিহ্নিত হল কিন্তু তার পরিবর্তে হারিয়ে গেল অগণিত মানুষের সামাজিক পরিচয়, বাসভূমি এবং দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে বুনে চলা সম্পর্কের বুনট। সরকারি খাতায় তাঁদেরকে নতুন নামে চিহ্নিত করা হল 'Refugee', যাঁদের কেউ নেই। সরকারের কাছে তাঁরা ছিলেন 'Permanent Liability'।[3] প্রকৃতপক্ষে দেশভাগকে কেন্দ্র করে বাংলা অভিধানে দুটি নতুন শব্দের সংযোজন হয় 'উদ্বাস্তু' আর 'বাস্তুহারা'।[4] ফলস্বরূপ সমগ্র বাঙালি সমাজ 'ঘটি' ও 'বাঙাল' এই দুই-এর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়। কলকাতা ও দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তু আগমন ও তাঁদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা, ২৪ পরগণা জেলার সামাজিক পরিমন্ডলে এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে চলে আসায় যেমন এদেশের সমাজ ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনই এক নতুন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে।[5] একদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করার সুযোগ না পাওয়ায় নিজেদেরকে বঞ্চিত বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে সামাজিক পরিমন্ডলে একটা 'আত্ম প্রতিষ্ঠার' অসম লড়াই শুরু হওয়ায় বহু মানুষ হতাশায় ভুগতে শুরু করেন। উদ্বাস্তু এবং আঞ্চলিকদের মধ্যেকার পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও হতাশার টানাপোড়েনে তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক বৃত্তের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটতে শুরু করেছিল।

৩.১ নিজভূমির স্মৃতি

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা তাঁদের সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এলেও জন্মভূমির প্রতি তাঁরা সারাজীবন গভীর টান অনুভব করেছেন। জন্মভূমির স্মৃতি তাঁদের কাছে আজীবন অমলিন থেকে গেছে। ২৪ পরগণাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের সকলের প্রায় একই ধরণের অভিজ্ঞতা ছিল। কবি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঢাকা থেকে আগত একজন বাস্তুহারা । তাঁর ছোট মেয়ে দময়ন্তী বসু সিং তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'ঢাকার প্রতি মা বাবার নস্টালজিয়া আমাদের মধ্যে বাহিত হয়ে এসেছিল অতি স্বাভাবিকভাবে...জীবনে ঢাকা না দেখে , বিক্রমপুর মালখানগর হাসারা না দেখে সর্বোতভাবে সে দেশের মানুষ বলে নিজেদের এখনো যে আমরা দাবি করি সেও মা বাবার থেকে আহৃত উত্তরাধিকার। কলকাতাই আমাদের একমাত্র শহর হওয়া সত্বেও কদাপি

[3] সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, দেশভাগ ও দেশত্যাগ, কলকাতা: অনুষ্টুপ, পৃ. ২৩।

[4] তদেব, পৃ. ২৪।

[5] Joya Chatterjee, *Spoils of Partition*; Bengal *and India*, New York: Cambridge University Press, 2007, p.290.

নিজেদের 'পশ্চিমবঙ্গীয়' ভাবি না আমরা। দেশ গাঁ না দেখলেও আমাদের শিকড় বদ্ধমূল সেই না দেখা দেশে পূর্বপুরুষের অস্তিত্বহীন ভিটেয়।'[6]

৩.২ উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের ব্যবহার

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ যখন পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষের কাছে সুখের সংবাদ নিয়ে এসেছিল তখন দেশভাগের ক্ষতে জর্জরিত হয়ে ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জীবনে নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। এপার ও ওপার বাংলার হিন্দুদের কাছে একই ঘটনার পৃথক ফল হয়েছিল। অথচ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা যখন ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে, উদ্বাস্তু কলোনিতে, ফুটপাতে, স্টেশনে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন অধিকাংশ স্থানীয় মানুষদের কাছেই তাঁরা অবহেলা পেয়েছেন। ক্যাম্পের অনেকে উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও বেশীরভাগই ছিল এর বিপরীত মানসিকতার।[7]

কেন, কীভাবে ভারত সরকারের অবহেলার ফলে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুরা জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তা দেখানো এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। ফলস্বরূপ এই সময় থেকে বামপন্থী নেতাবৃন্দ সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ধারা তৈরী করেছিল।[8] ১৯৪৭ সালের পর রাজ্য সরকার এই সমস্যা সামাল দেবার প্রচেষ্টা শুরু করে এবং সফলতা পায়। এই সকল ঘটনারই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা এই লেখার উদ্দেশ্য।[9]

যদিও সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ কিছুই করেনি, তথাপি যে সামান্য অর্থব্যয় এঁদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল সেই ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে, আঞ্চলিক আদি অধিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংঙ্কা করেছিল। স্থানীয় দরিদ্র মানুষের মনে উদ্বাস্তুদের প্রতি ঘৃণা ক্রমশই তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অধিকাংশ উদ্বাস্তুরা ছিলেন শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্গত। এইকারণে শহরাঞ্চল, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন শিক্ষা ও

---

[6] রূপা সেনগুপ্ত, *শূণ্যের মাঝে অমৃত কলস: দেশভাগ ও কলোনিজীবন*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১, পৃ. ৪৫।

[7] হিরন্ময় বন্দোপাধায়, *উদ্বাস্তু*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৭০ পৃ. ৬৭।

[8] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, পৃ. ৮৭।

[9] হিরন্ময় বন্দোপাধায়, *উদ্বাস্তু*, পৃ. ৮৭।

জীবিকার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। আদি অধিবাসীরা অনেক সময়ে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে নানারকম ব্যঙ্গক্তি করেছে যেমন - 'দুচার লাথি পড়লে ঘাড়ে, তবে বাংলা বুঝতে পারে'। আবার কখনো তারা এমনও বলেছে -

'ধোপা জানে কজন কাঙ্গাল
শ্যাকরা জানে কজন বাঙাল'[10]

দেশভাগকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের তিনভাগের একভাগ প্রতিবেশী অঞ্চলের সাথে জুড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যার তুলনায় বাসযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার মাপ ছিল ৩২,৩৩ বর্গমাইল, যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ৮৮,৯৫৩ জন-এই হারে জনসংখ্যা ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে স্বাভাবিকভাবেই যথোপযুক্ত খাদ্যের মজুত না হওয়ায়, ব্যাপক মাত্রায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। উদ্বাস্তু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছিল নতুন সমস্যা যা সমগ্র পরিস্থিতিকে ক্রমশই অগ্নীগর্ভ করে তুলেছিল।[11]

১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজস্থানের প্রচুর মাড়োয়াড়ীরা কলকাতার মতন একটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে ব্যবসা করার জন্য এসে ভীড় করেছিল। ফলে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা বাড়তে থাকে। এতে যোগ দেয় 'উদ্বাস্তু' জনসংখ্যা। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। আঞ্চলিক লোকেরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল, 'why should we sympathize with them, when they themselves show no affinity to West Bengal, consciously and constantly harking back to their glorious past.'[12] পশ্চিমবাংলার স্থানীয়রা উদ্বাস্তুদের 'অতিথি', 'guests' বলে প্রতিপন্ন করেছিল। উদ্বাস্তুদের সাথে স্থানীয়দের পারস্পারিক সম্পর্ককে 'guest-host' বলা হয়েছিল।[13] তাদের মনে তীব্র ক্ষোভ জন্মেছিল, কারণ সরকার তাদের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ টাকা অন্যায়ভাবে এই বহিরাগতদের জন্য ব্যয় করে। পরবর্তীকালে সরকার যখন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত উদ্বাস্তুদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিল তখন উদ্বাস্তুদের প্রতি স্থানীয়দের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, 'Refugees were not human beings but the golden egg lying hen to be killed at the end of the day out

[10] তদেব, পৃ. ৮৯।
[11] Sekhar Bandyopadhyay, *Decolonization in South Asia, Meaning of Freedom in Post Independence West Bengal, 1947-52*, London: Routledge Publication, 2012, p. 56.
[12] Pradip Kumar Bose (edited), *Refugees in West Bengal: Institutional Processes and Contested identities*, Calcutta: Calcutta Research Group, 2000, p.48.
[13] Ibid., p. 50.

of greed for more profit.'[14] এই সময় 'উদ্বাস্তু' বিষয়ে মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ, সরকারি মনোভাব, আন্দামান প্রকল্প (১৯৫৩), দন্ডকারণ্য (১৯৫৭), বিধান চন্দ্র রায় এবং সি পি আই, ইউ সি আর সি, পি এস পি পার্টি গুলির প্রসঙ্গ নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল। প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপিতে কঠোর পরিশ্রম করে তৈরী করেছিলেন ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, স্কুল, নলকূপ ইত্যাদি।[15] জীবনধারণের তাগিদে নির্মাণ করেছিলেন ছোট ছোট শিল্প কারখানা, যেমণ বিড়ি কারখানা। এছাড়া মাছ ধরা, কাঠের আসবাব তৈরী করার মতন কাজেও তাঁরা নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। জঙ্গল কে উদ্বাস্তুরা একটি নতুন গ্রামের রূপ প্রদান করেছিলেন। উদ্বাস্তুদের এরূপ উৎসাহ ও সফলতা প্রত্যক্ষ করে এর নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল 'নেতাজীনগর'। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বারংবার এঁদের বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু এই বিরোধীতা, সরকারি হেনস্থা ও স্থানীয় আদি অধিবাসীদের অসহযোগীতা উদ্বাস্তুদের ব্যাথিত করলেও তাঁদের মনের জোর বাড়িয়েছিল।

৩.৩ উদ্বাস্তুদের পারস্পরিক সহযোগিতা

২৪ পরগণা জেলা সহ কলকাতায় বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছিল সেখানে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে একত্রিত হয়েছিলেন। ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাত ও স্তরের মানুষ একই জায়গায় বসতি স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র যেমন এক স্থানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন তেমনি সেখানে বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, খুলনা, যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে আসা মানুষও ছিলেন।[16] ধনী বা গরিবের পার্থক্য উদ্বাস্তু কলোনিতে ছিল না। এত ভিন্নতা সত্বেও সদ্য গড়ে ওঠা কলোনির পরিবারগুলির মধ্যে গোষ্ঠীগত একতা গড়ে উঠেছিল। বাঁচার প্রয়োজনে তাঁরা একত্রিত হয়েছেন, একসাথে কাজ করার প্রচেষ্টা করেছেন। প্রতিবেশী পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের আদান প্রদান চলত সারা বছর ধরে। কিছু বিশেষ ধরণের খাবার রান্না হলে তা সবাই মিলেমিশে ভাগ করে নিতেন। খবরের কাগজ থেকে শুরু করে নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসও একে অপরের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন উদ্বাস্তুরা। যাঁর বাড়িতে রেডিও ছিল তাঁর বাড়িতে প্রতিবেশী পরিবারগুলির অনেকে জড়ো হয়ে রাতে পূর্ববঙ্গের রেডিওর

[14] Ibid., p. 51-52.

[15] জগদীশ চন্দ্র মন্ডল, *মরিচঝাঁপি: উদ্বাস্তু কারা এবং কেন*, কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫, পৃ ৩।

[16] বিমল হালদার, [৭৪, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৫.০৭.২০১৯।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনতেন এবং তাঁদের দেশের বাড়ির বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করতেন।[17] আবার তাঁদের জবর দখল করা জমি ধরে রাখার জন্য জমিদারের লেঠেল বা পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর তাগিদেও কলোনির উদ্বাস্তুদের ঐক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রতিবেশী, বন্ধু ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘস্থায়ীভাবেই এক নতুন আত্মীয়তার বন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল। উৎসবে, আনন্দে, বিক্ষোভে সর্বত্রই একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন তাঁরা।[18]

৩.৪ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের প্রয়াস

পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সেখানকার প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী। শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রতি তাঁদের আন্তরিক মনযোগ ছিল। এই প্রগতিশীল অংশ অভিবাসিত হয়ে কলকাতার শহরতলিতে এসেও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[19] প্রচন্ড দারিদ্র ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেও উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তাঁদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। উদ্বাস্তু যুবকরা পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্কুলবাড়ি তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন।[20] স্বচ্ছল উদ্বাস্তুরা স্কুলের জন্য জমি, গৃহনির্মাণের জন্য উপকরণ ইত্যাদি অনুদান করতেন। শিক্ষিত উদ্বাস্তুরা বিনা বেতনে স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করতেন। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির চাঁদা, পরিশ্রম ও সহায়তায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। বহু পরে এই স্কুলগুলি সরকারি অনুমোদন পায়। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মূলত পূর্ববঙ্গের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের মতোন করেই গড়ে উঠেছিল। স্কুলের ফি দেওয়ার সমস্যা থাকলে প্রয়োজনে ফি মুকুবও করা হত। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব থেকে উদ্বাস্তু পরিবারের ছাত্রদের জন্য বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি প্রদান করারও ব্যবস্থা করা হত। উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্যদের শিক্ষিত করার জন্য লড়াই একসাথে চলেছে।[21]

---

[17] পরিমল ব্যাপারী, [৬৪, সংহতি কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১০.১.২০২০।

[18] বিনয় মজুমদার, [৫৯, শ্রীকলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.০২.২০২০

[19] রত্না সাহা, (শিক্ষিকা, অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়), [৫৯, সন্তোষপুর বিধান কলোনি, কলকাতা], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২১.০২.২০২০।

[20] ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, *কলোনিস্মৃতি: উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা*, নিজেস্ব প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ ৩৪

[21] গৌতম রায়চৌধুরী, *দেশভাগ, কলকাতা:* গাঙচিল, ২০২৪, পৃ. ৬৭-৬৮।

৩.৫ পেশাগত পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া

দেশভাগের প্রভাব থেকে বাদ যায়নি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু যৌথ পরিবার। পূর্ববঙ্গের কৃষিভিত্তিক সামাজিক পরিকাঠামোয় যৌথ সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারীদের যৌথ অধিকার অর্পিত হত। অন্য দিকে পেশার ক্ষেত্রও ছিল এক। কিন্তু দেশভাগ, দাঙ্গা ও স্থানান্তর যেমন পরিবারের আভ্যন্তরীণ ভাঙনের কারণ হয়েছিল আবার পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁদের পেশা বা জীবিকার ক্ষেত্রেও। উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু জীবনে যাঁরা সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে পরিবার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বহু উদ্বাস্তুকেই যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে দূরবর্তী ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল কিংবা নতুন ভাবে গড়ে ওঠা কলোনিগুলিতে বসতি নির্মাণ করলেও স্থান সংকুলান এবং অর্থনৈতিক অভাবে তাঁদের পক্ষে যৌথ পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৭-৪৮ এর সময়কালে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ৩৭.৫৩ শতাংশ উদ্বাস্তু যৌথ পরিবার থেকে এসেছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে একক পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, যৌথ পরিবারের ভাঙন একদিকে যেমন উদ্বাস্তু পরিমন্ডলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল আবার বহু পারিবারিক প্রথা ও সংস্কার চিরতরে বিলুপ্ত হয়েগিয়েছিল।[22] পারিবারিক সম্পর্ক বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের সমাজেও বদল ঘটেছিল। যার উল্লেখ যেমন ইতিহাসে রয়েছে আবার সাহিত্যেও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র সেনের 'পুব থেকে পশ্চিম' উপন্যাসটি প্রাসঙ্গিক। এই উপন্যাসের নায়ক নির্মল। তারই তত্বাবোধানে নির্মিত হয় ' তিলক নগর' কলোনি। সময়ের সাথে সাথে কীভাবে এই কলোনির বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই বদলে গিয়েছিল তারই একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[23] এই গল্পে কলোনি নির্মাণের একেবারে গোড়ার দিকে, নির্মলের সাথে আলাপ হয় বরিশালের পিরোজপুরের বাসিন্দা জয়দ্রথর, যিনি একজন লাঠিয়াল যাঁকে সবাই ভয় করত, পেশা পরিবর্তন করে ঘরামি হয়েছিলেন। এরূপ পেশা পরিবর্তনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নামও আমরা পাই হরিভূষণ, জটিল, অভিরাম। জটিল পেশায় একজন নৌকার মাঝি ছিলেন কিন্তু নিজের পেশা পরিবর্তন করে রিকশা চালানোর পেশা বেছে নেন সাংসারিক প্রয়োজনে। [24] অন্যদিকে অভিরাম পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু উদ্বাস্তু কলোনিতে স্থীত হয়ে তিনি তাঁর সামান্য পড়াশোনা জানার গুণকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন আর

---

[22] Kanti B. Pakrasi, *The Uprooted: A Sociological Study of Refugees of West Bengal*, Calcutta: Calcutta University, 1971, p.33.

[23] আশীস হীরা, *উদ্বাস্তু: ইতিহাসে ও আখ্যানে*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৯, পৃ. ১৭৫।

[24] তদেব, পৃ. ১৭৫।

তাই কলোনির অফিস ঘরের বারান্দাতেই পাঠশালা খুলেছেন, কলোনির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। এমন করেই বদলে গিয়েছিল উদ্বাস্তু জীবনের সমীকরন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের এরূপ পেশাগত পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজ বদলের পথও প্রশস্ত করেছিল।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে সব শ্রেণীর, সব পেশার মানুষজনই ছিলেন। শ্রমজীবী থেকে বুদ্ধিজীবি, তাঁতী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রভৃতি সকল পেশার মানুষ। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা সহ ২৪ পরগণাতেই স্থায়ী হয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ নিজেদের বংশগত পেশায় সফল হলেও অধিকাংশ উদ্বাস্তুই তাতে সফল হননি। নতুন স্থানে অচেনা শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীরা বা ডাক্তারদের কাছে রোগীরা যেতে চাইত না। ধোপা বা নাপিতদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তু যাঁরা এই অঞ্চলে নতুন ছিলেন তাঁদের প্রতি সহজেই আদি অধিবাসীদের বিশ্বাস নির্মিত হয়ে যায়নি।[25] কিন্তু উদ্বাস্তু জীবনের প্রবাহ অন্য এক মাত্রা সংযোজন করেছিল। শ্রমজীবীদের অধিকাংশও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিস্মৃত পরিসরে, একে অপরকে খোঁজ দিয়েছেন কাজের । পূর্ববঙ্গের সীমানা পেড়িয়ে কলকাতা পর্যন্ত একাধিক অঞ্চলের রূপরেখা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছিল উদ্বাস্তু অভিবাসনে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যেভাবেই হোক কিছু একটা করবার দুর্নিবার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই তাঁদের কাছে কোনো বাধাই বাধা হয়ে থাকেনি। সেই মুহূর্তে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কাজের সন্ধান করা, তাই কোনও কাজকেই তাঁরা গুরুত্বহীন বলে মনে করেননি।[26] বাড়ি বাড়ি পেন্সিল বিক্রি করা, গামছা, ধূপকাঠি, বাসনপত্র ইত্যাদি বিক্রী করার মধ্যে দিয়েও উপার্জন করেছেন বাঁচার তাগিদে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক সীমাবদ্ধতা, পারিবারিক সীমাবদ্ধতা কে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁরা পৌঁছিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামে গঞ্জে, শহর নগরে। উদ্বাস্তু মহিলারাও ঘরে তৈরি জিনিস বাজারে গিয়ে বিক্রি করতেন এবং পরিবারের সকলে সকলের কাজে সাহায্য করতেন। ঘরে তৈরি হাতের কাজের জিনিস, মাটির পাত্র, মাটির সরা, পটচিত্র, কুলো, ঝুড়ি এসব তৈরি করে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন।[27]

---

[25] Sandip Bandyopadhyay, "Millions seeking refugee: The Refugee question in West Bengal, 1971", in Pradip Kumar Bose (ed.), *Refugees in West Bengal: Institutional Processes and Contested Identities*, KolKata: Mahanirban Calcutta Research Group , 2000, p. 67.

[26] বিমান সমাদ্দার, *শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনি, আত্মপরিচয় নির্মাণের আখ্যান*, কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩, পৃ. ৬৭।

[27] আশিস হীরা, *উদ্বাস্তু: ইতিহাসে ও আখ্যানে*, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৯, পৃ. ৪৬-৪৭।

উল্লেখ্য, আরেক দল উদ্বাস্তু যারা পড়াশোনা জানতেন তারা কলোনিগুলিতে কিভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যায়, তা নিয়ে ভেবেছেন। প্রথম থেকেই এদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা গিয়েছিল। একটা আত্মসচেতনতা সকলের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। সমাজে উপযুক্ত সন্মান পেতে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত কাজ পাওয়া আর তার জন্য সর্বাপেক্ষা সহজ রাস্তা যে শিক্ষা গ্রহণের পথ তা বুঝতে বেশি দেরী করেননি উদ্বাস্তু সমাজ। আর এই কারণেই প্রতিটি উদ্বাস্তু কলোনিতে সমগ্র ১৯৫০ ও ৬০'এর দশক জুড়ে একের পর এক স্কুল নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান যাতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, উদ্বাস্তু পরিবারগুলি জীবনযুদ্ধে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ লড়াই করে গিয়েছেন। যা তৎকালীন আঞ্চলিক আদি অধিবাসীদের অবাক করেছিল। উদ্বাস্তুদের এমন চেষ্টা বা ঘুরে দাঁড়ানোর এই তীব্র আকাঙ্খা বাস্তবে সকলের নজর কেড়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[28] ভবিষ্যতে উদ্বাস্তুদের একাধিপত্যের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কলোনির আদি অধিবাসীরা। উল্লেখ্য এই সময়ে ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের ভীড় ক্রমশ হালকা হতে শুরু করেছিল। বদলে গিয়েছিল উদ্বাস্তুদের জীবনধারা। কম শিক্ষিত, খেটে খাওয়া উদ্বাস্তুরা যতটা তাড়াতাড়ি নিজ পরিবারের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী উদ্বাস্তুরা কিন্তু ততটা তাড়াতাড়ি তা করতে পারেননি। কারণ তাদের পেশায় প্রতিযোগিতা ছিল। তাই প্রথম পর্বে শিক্ষিত উদ্বাস্তুরা 'প্রাইভেট টিউশন' পড়ানোর পথ বেছে নিয়েছিলেন।[29] নিজেদের যোগ্যতা ও শিক্ষার পরিচয় দিয়ে পেশার প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং ক্রমশ তাঁরা বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপক, করণিক, সরকারি বিভিন্ন অফিসে যোগ দেওয়ার মতন বৃহত্তর কর্মজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন প্রতি মুহূর্তে। আদালত, কলকারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন উদ্বাস্তুরা। উদ্বাস্তুদের ছিল চরম মূল্যবোধ এবং কঠোর পরিশ্রমের মনোবল। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। চূড়ান্ত দারিদ্র্য ও পরিস্থিতির চাপে উদ্বাস্তু যুবকরা অনেকেই বিপথে চালিত হয়েছিলেন।

---

[28] সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, *দেশভাগ: স্মৃতি আর সত্তা*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬।

[29] তদেব, পৃ. ১৭-১৮।

৩.৬ সাংস্কৃতিক প্রসার

প্রতিটি জাতিরই কিছু পৃথক সংস্কৃতি থাকে। দীর্ঘদিন ধরে ধীর প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জাতির নিজেস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন জনগোষ্ঠীকে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেলেও, নিজেস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তবে, অভিবাসিত জনগোষ্ঠীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ সংস্কৃতির খানিকটা পরিবর্তন ঘটাতে হয়।[30] যদিও নিজ দেশ ত্যাগ করে নতুন দেশে নতুন সংস্কৃতির মধ্যে এসে পড়লেও, মনের গভীরে নিজ সংস্কৃতিকে মানুষ ধরে রাখে আমৃত্যু। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ মূলত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, সেখানে হিন্দু সংস্কৃতির একটা ধারা বহমান ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল মুসলমানরা নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রেখেছিল ঠিকই তবে তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল হিন্দু সংস্কৃতি। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু সমাজ এই সংস্কৃতি এই চিন্তা চেতনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে।[31] তাঁদের এই সাংস্কৃতিকবোধ সমগ্র ২৪ পরগণা, কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীর স্থানীয় সাংস্কৃতিক জগৎকে প্রভাবিত করেছিল। কিছু নির্দিষ্ট উদ্বাস্তু সংস্কৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে-

(ক) পদ্মাপুরাণের আসর:

বরিশালের কবি বিজয় গুপ্তের লেখা 'পদ্মাপুরাণ' নামে মনসা মঙ্গলের কাহিনী পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। পূর্ববঙ্গের গ্রামবাংলায়, পাড়াতে বছরের বিভিন্ন সময়ে এই পদ্মাপূরাণের পালা অনুষ্ঠিত হত। কাজের শেষে সন্ধ্যায় পদ্মাপুরাণ পালায় অংশগ্রহণ করতেন সকলে। দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা যখন নতুন দেশে বসতি স্থাপন করলেন তখনও এই ঐতিহ্য বজায় ছিল।[32]

(খ) মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিবোল কীর্তন:

পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল দলিত সম্প্রদায়ের বাস। হরিচাঁদ ঠাকুরের সৃষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় 'মতুয়া সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ছিল। এঁদের একটি বড় অংশ হরিচাঁদ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

---

[30] মধুময় পাল, *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, কলকাতা: গাংচিল, পৃ. ৫৭।

[31] সৌমেন চক্রবর্তী, *বহুত্বরে উদ্বাস্তু সত্তায় বাঙালি*, কলকাতা: মুক্তমন, বাংলা সন ১৪৯৯, পৃ. ৪৪।

[32] অভিজিৎ সেন, "বাস্তুহারা", মোহন ঘোষ (সম্পা.), কথাকলি, *শারদ সংখ্যা*, ১৪১৬ ব., পৃ. ৭০।

অভিবাসনের পর এই উদ্বাস্তুরা সবচেয়ে বেশি আশ্রয় নেয় ২৪ পরগণা জেলায়। উনিশ শতকে প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুর ও পরে তাঁরই পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন হয়। এই আন্দোলননের উদ্দেশ্য ছিল দলিত মানুষদের জীবনের সার্বিক মান বৃদ্ধি করা।[33] ক্রমশ এই আন্দোলন একটি বলিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন, 'শক্তি না দেখিলে কেহ না সম্মান করে, শক্তিশালী হতে সবে হও যত্নবান'। উল্লেখ্য, এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের উপর। এঁদের মধ্যে ঢাক, ঢোল, কর্তাল বাজিয়ে কীর্তন, মহোৎসব করা, একইসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করার প্রচলন ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

(গ) বারোয়ারি শীতলা পূজা:

পূর্ববাংলার অধিকাংশ গ্রামে বারোয়ারি শীতলা পূজা করা হত। পূজার দিন অরন্ধন প্রচলিত। ঘরের রান্না না করার পরিবর্তে মেয়েরা সেদিন এই পূজার আয়োজন করত।[34] এই ধারা বর্তমানেও পালন করা হয়। যা 'শীতলা পান্তা' নামেও প্রসিদ্ধ, কারণ সেদিন কোন আগুন জ্বালানো যায় না, আগের দিনের জল ঢালা ভাতই পরের দিন খাওয়া হয়। এই পূজায় কূলো নিয়ে বাড়ির মেয়েরা, বউরা ভীক্ষা মাগতে বাড়ি বাড়ি যান।[35] পূজা শেষ হলে সেই কূলা জলে ভাসানো হয়। কলকাতাতে, উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে এই পূজা এখনো পালন করা হচ্ছে।

(ঘ) লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উৎসব:

ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে লোকনাথ বাবার আশ্রমকে কেন্দ্র করে তাঁর ধর্মীয় মতবাদ সারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'রণে, বনে, জঙ্গলে- যেখানে বিপদে পড়িবে আমায় স্মরণ করিবে, আমি রক্ষা করিব'- এই মন্ত্র উচ্চারণে সকলে তাঁকে স্মরণ করে। ১৯ শে জৈষ্ঠ তারিখে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবসে তাঁর পূজার প্রচলন হয়।[36] দেশভাগের পর যখন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তখন তাঁদের সাথে এই পূজাও চলে আসে। বর্তমানে কলকাতার প্রতিটি পাড়ায়, প্রায় প্রতিটি ঘরে লোকনাথবাবার পূজা করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায়

---

[33] Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *Caste and Partition in Bengal: The Story of Dalit Refugees, 1946-1961*, New York: Oxford Publication, 2022, p. 78.

[34] মিতালি ঘোষ, [৪৩ কাটজুনগর কলোনি]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.০৪.২০২২।

[35] কাজল রায়, [৬৪ কাটজুনগর কলোনি] সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.০৪.২০২২।

[36] ননীবালা দাশ, [৫৯ সন্তোষ্পুর বিধান কলোনি]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৬.০৫.২০২১।

লোকনাথ বাবার মূর্তি, মন্দির ও আশ্রমও গড়ে তোলা হয়েছে।[37] লোকনাথ বাবা বর্তমান সময়ে শহুরে বাড়ি ও ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালে আজও বিরাজমান ও জনপ্রিয়।

এ ভাবেই উদ্বাস্তু সংস্কৃতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে ও গ্রামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশভাগ এবং দেশান্তর একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই নিঃশব্দে নীরবে চলেছে নানান পারস্পারিক সম্পর্কের ভাঙ্গাগড়া। ১৯৪৭ সালে একদিকে দেশ স্বাধীন হয় এবং অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিত হয় সে প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু অভিবাসন একদিকে যেমন উদ্বাস্তুদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল অন্যদিকে এই অভিবাসন পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষের জীবনেও পরিবর্তন এনেছিল যে পরিবর্তনের জন্য উভয়পক্ষই প্রস্তুত ছিল না।[38] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুরা নিজেদের মাথা গোঁজার স্থান সন্ধান করতে শুরু করেন। সরকারি ক্যাম্প, জবরদখল কলোনি, আবার সরকার থেকে দেওয়া জমিতে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন উদ্বাস্তুরা।[39] পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষেরা উদ্বাস্তুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও, সময়ের সাথে সাথে উদ্বাস্তুদের সাথে তাঁদের সম্পর্কের পরিবর্তন হতে শুরু করে। কেন এইরূপ পরিবর্তন হয়েছিল তা আগের আলোচনায় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গীয় আঞ্চলিক মানুষের মননশীল জগতে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। পরবর্তী অংশে উদ্বাস্তু ও আদি অধিবাসীদের মধ্যেকার সম্পর্কের টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্বকে বোঝার চেষ্টা করা হল।

উদ্বাস্তু সমাজের দ্বিধা ও দ্বান্দিকতা:

উদ্বাস্তু সমাজের দ্বন্দ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত: উদ্বাস্তুদের সাথে পূর্ববর্তী অধিবাসীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত: উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার প্রজন্মভিত্তিক দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার বিভিন্ন প্রজন্ম বা জেনারেশানের মধ্যে উদ্বাস্তু ‘পরিচয়’ ও ‘সত্তা’ নিয়ে দ্বন্দ্ব।

উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী মানুষদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক আজও সহজ সরল ও স্বাভাবিক হতে পারেনি। একই পাড়ায় এমনকি একই বাড়িতে একসাথে বসবাস

---

[37] প্রতিমা রায়, [৭৪, সন্তোষ্পুর বিধান কলোনি, (আঞ্চলিক বটতলা অঞ্চলের লোকনাথ মন্দির কমিটির সদস্য)], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৬.০৫.২০১৯।

[38] আশিস রায় (সম্পাদনা), ‘সম্পর্ক’, *এবং প্রান্তিক*, মে, ২০২১, পৃ. ৫৫।

[39] তদেব, পৃ. ৫৬-৫৭।

করার পরেও উদ্বাস্তুরা নিজেদের দেশেই ফিরে যেতে চেয়েছেন। কারণ 'আজও এদেশীয়দের সাথে বনে না', 'ওরা তো ওপার বাংলার রেফেউজী', 'পাত্র বা পাত্রী ঘটি নাকি বাঙাল?' এমন সব প্রশ্নগুলি আজও শোনা যায়।

তবে একথাও ঠিক উভয়ের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক দৃঢ় না হলেও বা হৃদয়ের মেলবন্ধন না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রসায়ন অবশ্যই গড়ে উঠেছে। যেমন পশ্চিমবংলার 'ঘটি' মানুষেরা তাদের খাদ্য তালিকায় যোগ করেছেন পদ্মার ইলিশ, কলমী শাক, নটে শাক আবার পূর্ববঙ্গের বাঙাল উদ্বাস্তুরা একইভাবে নিজেদের খাদ্য তালিকায় রেখেছেন চিংড়ি মাছের মালাইকারি, এঁচোড় চিংড়ি। একে অপরের খাদ্যাভ্যাসকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনিভাবে বাঙালদের আটপৌরে শাড়ি পরার বিশেষ ধরণ হয়ে উঠেছে নতুন ফ্যাশান অথবা শেষপাতে নিয়েছেন পানের স্বাদ। ঘটিদের প্রিয় মাছের টক ঝোল অম্বলের স্বাদ উপভোগ করেছেন বাঙালরাও। কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার বৈপরীত্য নানা সময়ে প্রকট হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে বাঙাল হয়েও বাঙাল কথা বলার বিশেষ ধরণকে বদলাতে হয়েছে বহুক্ষেত্রে। প্রশ্ন যে এরূপ বদলের প্রয়োজন কি? বাঙাল কথা বলতে ভালো লাগলেও বাঙাল কথা বললেই পাশে থাকা লোকেরা আজও প্রশ্ন করে 'তুমি কি বাঙ্গাল, উদ্বাস্তু?'

এই প্রশ্নের উত্তরে গর্ববোধ করে বলি 'হ্যাঁ, আমি বাঙাল'। আমি প্রান্তিক উদ্বাস্তু পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তান হয়েও বাংলাদেশে না গিয়েও নিজ শিকড়ের সাথে যেমন একটা সম্পর্ক অনুভব করি, আবার ঠিক একইভাবে সম্পর্ক রয়েছে পশ্চিমবাংলার সকলের সাথেও। বাঙাল পরিবারে বাংলাদেশের নানান গল্প শুনেই আমার বেড়ে ওঠা। জন্মলগ্ন থেকেই এই পরিচয়ে গর্ববোধ করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরূপ অনুভব প্রকাশ করলে ঘটিরা বলে তারা কেন বাঙালদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে কারণ বাঙালরা এত বছর পরেও পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেনা। কিন্তু কেন পারেনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাঙাল উদ্বাস্তুদের মন থেকে পূর্ববাংলার স্মৃতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কাছে টেনে নিতে? পারেনি? না কি ভয় ও স্বার্থ তাদের বাধা হয়েছে?

আরেকটি বিষয় নিয়ে ভাবা প্রয়োজন তা হল উদ্বাস্তু সত্তার খন্ডিত অস্তিত্ব। এই পরিবর্তন উদ্বাস্তুদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও দেখা যায়। কি কারণে তারা তাদের 'উদ্বাস্তু সত্তা'কে কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই অস্বীকার করার পথে এগিয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে ভাবা প্রয়োজন। কেন পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব থেকে উদ্বাস্তু সত্তাকেই মুছে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছিল ?

উদ্বাস্তুরা শিক্ষা ও চাকরির প্রয়োজনে তাদের নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে নতুন রাজধানী শহর কলকাতার আদব কায়দায় পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে এসে শহুরে জীরনে ইংরাজি শিক্ষা ও আদব কায়দাতে অভ্যস্ত হয়েছিল নতুন প্রজন্ম।

উদ্বাস্তু সমাজে আরেকটি নতুন বিষয় জন্ম নিয়েছিল, তা হল 'দ্বন্দ্ব'। উদ্বাস্তু মনের মধ্যে নির্মিত এই জটিল সমস্যার সূত্রপাত সম্পর্ক থেকেই।[40] কীভাবে উদ্বাস্তু মনে প্রবল দ্বান্দ্বিকতার ভিত্তি নির্মাণ হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

উদ্বাস্তুরা ভেবেছিলেন একই ভাষা, একই পরিবেশ, জলবায়ু, প্রায় একই সংস্কৃতি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গেও ছিল, তাই খুব সহজেই তাঁরা নতুন জায়গাতে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দু সমাজে 'বাঙাল' ও 'ঘটি'দের মধ্যে ভাগ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই নতুন জায়গাতে উদ্বাস্তুদের মানিয়ে নিতে যেমন সময় লেগেছিল আবার পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও উদ্বাস্তুদের মেনে নিতে সময় লেগেছিল।

অন্যদিকে, উদ্বাস্তুদের যদি আলাদা আলাদা প্রজন্ম বা জেনারেশনে ভাগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে তৃতীয় প্রজন্মরা (১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী) নিজেদেরকে 'রিফিউজি' বা কলোনিবাসী বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। যা তাদের আগের প্রজন্মের কাছে গৌরবের পরিচয় বহন করেছে তাই আবার তাদের কাছে চূড়ান্ত অপমানকর।[41] এখন প্রশ্ন হল, কেন এই 'উদ্বাস্তু পরিচয়' তৃতীয় প্রজন্মের কাছে লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে? মূল কারণ রূপে বলা যেতে পারে তাদের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে হওয়ায় তারা কখনোই পূর্ববঙ্গের প্রতি কোনো টান বা কোনো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারেনি যা তাদের আগের প্রজন্মরা(৫০ থেকে ৭৫ বা তার বেশী বয়সী প্রথম প্রজন্ম এবং ৩০ থেকে ৪৯ বয়সী দ্বিতীয় প্রজন্ম) পেয়েছিল। তাই তারা প্রতি মুহূর্তে শিকড়ের প্রতি টান অনুভব করেছে। যে ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল অতীত প্রজন্মকে সেই অভিজ্ঞতাও তৃতীয় প্রজন্মের ছিল না। তাই তারা বাঙাল ভাষায় কথা বলতে চায় না বা অনেক সময় পরিবারের লোকেরাই বাধা দেন।[42]

---

[40] নীলেন্দু সেনগুপ্ত, *দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব*, কলকাতা: একুশ শতক, ২০১৯, পৃ. ৬৭।

[41] Monika Mandal, *Settling the Unsettled: A Study Of Partition Refugees in West Bengal*, New Delhi: Manohar Publishers and Distributors, 2011, p. 34.

[42] Ibid., p 80-81.

তৃতীয় প্রজন্ম মনে করে তাদের কথা বলার ধরণ, উদ্বাস্তু পরিচয় তাদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই পরিশীলিত বাংলা ভাষাতে কথা বলতেই তারা অধিক স্বাচ্ছন্দবোধ করে। তাই বিপরীত পরিস্থিতির সাথে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই একপ্রকার 'মানিয়ে নেওয়ার' প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেও রয়েছে প্রবল দ্বান্দ্বিকতা। কারণ মানিয়ে নেওয়াটা খানিকটা বাধ্য হয়েই। বিপরীত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব কাজ করেছে।[43] বর্তমান সময়কালেও কলোনির সমীক্ষা করার সময়ে (সমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে) এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা হলেন প্রথম প্রজন্মের এবং যাঁদের স্মৃতি আজও জীবন্ত। তাঁরা আজও নিজেদেরকে 'উদ্বাস্তু' পরিচয়েই পরিচিত করতে গর্ব অনুভব করে থাকেন।[44] তবে এঁরা অনেকেই বর্তমানে সুখী নন।বারবার তাঁরা ফিরে যেতে চেয়েছেন 'নিজেদের দেশে' (পূর্ববঙ্গ)। সেখানের (পূর্ববঙ্গ) একাত্মবোধ, ভালোবাসা বা আন্তরিকতার অভাববোধ করেছেন এখানে (পশ্চিমবঙ্গ)। তাঁরা তাঁদের এই বিশেষ পরিচয়কে নিজেদের জীবনের সঙ্গে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে ধরে রাখতেই অধিক স্বাচ্ছন্দবোধ করেন থাকেন।

এই টান আবশ্যিকভাবেই তৃতীয় প্রজন্মের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় প্রজন্ম যাঁদের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ হলেও তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁরা ঐ পুরাতন স্মৃতিকে ভুলে যেতে চাননি। আবার অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে উদ্বাস্তু পরিচয়কে অক্ষুন্ন রেখেও অনেকে কলোনির গন্ডিতে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারেনি, চলে গিয়েছেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে, দেশে বিদেশে।[45] মূল উৎপাটনের অভিজ্ঞতা এই সকল মানুষদের উৎসাহী করেছে আরো নতুন নতুন ক্ষেত্র জয় করতে, নতুন পরিচয় নতুন স্থানকে সঙ্গী করতে হয়েছে পরবর্তী উদ্বাস্তু সমাজ বা উদ্বাস্তু সংস্কৃতিকে। স্বদেশহারা বাস্তুচ্যুত অবস্থা থেকে ক্রমে তাঁদের প্রকাশ হয়েছে বা হচ্ছে বিশ্বনাগরিকত্বে।

ভৌগলিকভাবে একই অঞ্চলে বসবাস করলেও ঐতিহাসিকভাবে উদ্বাস্তু এবং আদি অধিবাসীরা আলাদা।[46] যার প্রতিফলন বিবাহের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। বাঙালরা ঘটিদের সাথে বা ঘটিরা বাঙালদের সাথে কখনোই পারস্পারিক বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ইচ্ছুক হয়না।

---

[43] Ibid., p 81-82.

[44] দেবযানী ঘোষ (সম্পাদনা), *দেশভাগ: অকথিত ইতিহাস,* কলকাতা: গাঙচিল, পৃ ৫৬।

[45] তদেব, পৃ. ৫৬।

[46] তদেব, পৃ. ৫৭-৫৮।

তবে একথাও সত্য, তৃতীয় প্রজন্মে যেহেতু ভালোবাসার বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ১৯৬০ ও ৭০-৯০ এর দশকে বাঙাল ও ঘটির মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ককে মেনে নেওয়া হয়েছিল। দুটি পৃথক পৃথক চুক্তির ভিত্তিতে (১) যদি ঘটি হয় তাহলেও তাদের মধ্যে ঘটি টান বা প্রলক্ষণ থাকা যাবে না বাঙালদের সব নিয়ম মেনে নিতে হবে। (২) অথবা যদি যথাযথ সুযোগ্য পাত্র বা পাত্রী না পাওয়া যায় তাহলে ঘটিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবা হয়েছে বাঙালদের মধ্যে। কিন্তু এমন ধারণার পরিবর্তনও ঘটেছে। উদ্বাস্তু ও আঞ্চলিকদের মধ্যেকার পারস্পারিক ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুক্ষেত্রে। তাঁদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রসায়ন নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে পারস্পারিক দূরত্বকে অনেকটাই হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন দুপক্ষই। দুই দিকের মানুষ যাঁদের ভাষা এক (যদিও উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে), মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য এক তাঁদের মধ্যে দূরত্ব দীর্ঘায়ত করা সম্ভব হয়নি। সীমানা অতিক্রম করার পর এমনও বহু উদ্বাস্তু ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে আঞ্চলিকদের সাথে মিলিয়ে ফেলার জন্য তাঁদের বৈশিষ্ট্য এমনকি তাঁদের নামও পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।[47] ইতিহাস হিসেবে নয় ইতিহাসের জীবন্ত উত্তরাধিকার হিসেবে এই প্রসঙ্গকে মনে রাখা প্রয়োজন।[48]

৩.৭ রাজনৈতিক টানাপোড়েন

উদ্বাস্তু এবং তৎকালীন রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার সম্পর্ক: ইউ সি আর সি:

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম পর্বে উদ্বাস্তু সমাজের সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক রূপায়ন এবং উদ্বাস্তু সমাজের দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু সমাজের মানুষেরা কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হয়ে উঠেছিল তা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই পর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিন্যাস।

উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে 'ঠাঁই হারার' যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই 'ঠাঁই নির্মাণে'র লড়াই চলেছে।[49] যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যের অধিকারের জায়গাতে আঘাত না করে লড়াই করে নিজেদের

[47] Monika Mandal, *Settling the Unsettled: A Study Of Partition Refugees in West Bengal*, p. 76.
[48] Ibid., p. 77.
[49] অনিল সিংহ, *পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, কলকাতা: বুক ক্লাব, ১৯৯৫, পৃ. ৮৭।

'পরিচিতি' ও 'অস্তিত্বকে' নির্ধারণ করা। উদ্বাস্তু কলোনিতে বসতি স্থাপনে উদ্বাস্তু সমাজ সংস্কৃতির বদল ঘটেছে। আবার অন্যদিকে উদ্বাস্তুরা নিজেদের 'উদ্বাস্তু' পরিচয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের নাগরিক 'পরিচিতি' ও অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। এই পরিচিতি বা আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উদ্বাস্তুরা কিভাবে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিল তা বর্তমান আলোচ্য বিষয়।[50]

তৎকালীন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের পথ কে অনেকবেশী মাত্রায় প্রশস্ত করেছিল 'উদ্বাস্তু আন্দোলন'।[51] উদ্বাস্তু অভিবাসন, কলোনি নির্মাণ এ সমস্ত কিছু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চরিত্র নির্মাণের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল। অন্যদিকে 'উদ্বাস্তু জনগণ' কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের নতুন পরিবেশে নিজেদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেছিল তা একটি বিচার্য বিষয়।

উদ্বাস্তু অভিবাসন ও পুনর্বাসন পর্বে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে অন্যতম দলগুলি ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি, পি.এস.সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি প্রভৃতি।[52] উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হলে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিজেদের জায়গা নির্মাণ করার এবং উদ্বাস্তুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ পায়। কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরকার বিরোধী উদ্বাস্তু আন্দোলনে সামিল হয়ে উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ায়। উদ্বাস্তু এবং তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দল- উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন ছিল। বিরোধীদলের প্রয়োজন ছিল রাজনীতিতে নিজেদের একটা শক্তপোক্ত জায়গা তৈরি করা অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন ছিল একটা সচেতন রাজনৈতিক দলের হাত ধরে নিজেদের অধিকার ও জায়গাকে সুনিশ্চিত করা। এই তাগিদ থেকেই উভয়ের মধ্যে এক অভিনব সম্পর্কের বুনন চলেছে।[53] এই অধ্যায় যেহেতু 'সম্পর্ক' ভিত্তিক সে কারণেই উদ্বাস্তুদের রাজনীতির সম্পর্ক এখানে প্রাসঙ্গিক ।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বামপন্থী দলগুলির প্রয়োজন ছিল এমন একটা নির্দিষ্ট পথ অনুসন্ধানের যে পথে এগিয়ে গিয়ে তারা

---

[50] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৯৭, পৃ২১

[51] তদেব, পৃ. ৪৫।

[52] সুজন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রামঃ বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃ. ৪৩।

[53] তদেব, পৃ. ৪৫।

কংগ্রেসের মতন শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দলের সাথে লড়াইয়ে নামতে পারে, 'উদ্বাস্তু সমাজ' তাদেরকে সেই পথের সন্ধান দেয়। এই উদ্দেশ্য কে বাস্তবায়িত করতে নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের নিজেদের 'ছাতার তলায়' আনার চেষ্টা করে।[54] রাজ্য সরকার যখনই উদ্বাস্তু বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তখনই উদ্বাস্তুরা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণকে সামনে রেখে এই আন্দোনের সূত্রপাত। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ নীতি, অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব, ভোটাধিকারের দাবী, দন্ডকারণ্য প্রকল্পের বিরোধীতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক চেতনা:

উদ্বাস্তুদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছে। এরমধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট রাজনীতি উদ্বাস্তুদের সমর্থনে তাদের পাশে এসে না দাঁড়ালেও পরবর্তীতে এই রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। কারণ তারা উপলব্ধী করেছিল, উদ্বাস্তুরা যদি কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আন্দোলন সরকার বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। বিজয় মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সদস্য যিনি উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তিনি উদ্বাস্তু কলোনিতে নানান কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য, উদ্বাস্তুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এবং কলোনিগুলিতে কাজ করার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে আত্মপরিচয় গোপন করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণরূপে বলা যেতে পারে, প্রথমদিকে কমিউনিস্টরা উদ্বাস্তু বিরোধী হলেও, উদ্বাস্তুরা যাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী না হয়ে ওঠে, সেই বিষয়কে মনে রেখে সরাসরি নিজেদের দলে উদ্বাস্তুদের জায়গা না করে দিলেও, গোপনে উদ্বাস্তু সমর্থন লাভের আশায় উদ্বাস্তু কলোনির জন্য কাজ করতে শুরু করে এবং এর মধ্যে দিয়েই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্মিত হয়।[55] এই সম্পর্কের প্রথম লগ্নে কিভাবে উদ্বাস্তুরা আন্দোলন শুরু করেছিল তা বিবেচ্য।

---

[54] তদেব, পৃ. ৪৬-৪৭।

[55] বিমান সমাদ্দার, *শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনি: আত্মপরিচয় নির্মাণের আখ্যান*, কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩, পৃ. ৩৪।

মৌলিক অধিকার ও দৈনন্দিন চাহিদাকে মনে রেখে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে উদ্বাস্তু সমাজ। এই পর্যায়ের আন্দোলনে করেকজনের নাম করা যাতে পারে। অরুণেশ্বর ঘোষাল, সুনীতি সিংহ রায়, মাখনলাল ব্যানার্জী, হারাধন ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র দাস, বেণীমাধব দাস, পুলিনবিহারী চৌধুরী, কমলা দাশগুপ্ত, অনিমেষ রাউত, নগেন নন্দী , নিকুঞ্জবিহারী নাথ, শশাঙ্ক মুখার্জীর নাম করা যেতে পারে- যাঁরা এই আন্দোলনে সামিল ছিলেন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অধিকারের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যখন তার পূর্বের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি তখন বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তু জনগণ ইউ সি আর সি-এর যোগ্য নেতৃত্বে নিজ উদ্যোগে এবং তৎকালীন বামপন্থী দলগুলির সাহায্যেক অসংখ্য 'জবরদখল কলোনি' গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হয়।[56]

কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ইউ সি আর সি (United Central Refugee Council):

বামপন্থী দলের নিয়ন্ত্রণে ইউ সি আর সি'র নির্মাণ হয়। উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদানে ও তাদেরকে সংগঠিত করতে এর গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৫০ এর ১২ই আগস্ট উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে ইউ সি আর সি'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠীত হয় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে।[57] উদ্বাস্তুদের সঙ্গবদ্ধতা এবং সি পি আই রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার সম্পর্কে ভীত হয়েছে কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেসের চেষ্টা ছিল উভয়ের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনিগুলি থেকে উচ্ছেদের জন্যে নতুন একটি 'উচ্ছেদ আইন' প্রণয়নের কথা ভাবা হয়। যাকে বলা হল 'unauthorized persons eviction bill'।[58] এই বিলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ তে ইউ সি আর সি'র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন কলোনির উদ্বাস্তুরা এই সভায় যোগদান করে। ইউ সি আর সি এই বিলের প্রতিবাদ স্বরূপ 'এভিকশন রেজিস্ট্যান্স কমিটি' নির্মাণ করে। কিন্তু তা সত্বেও ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল

---

[56] 'পুনর্বাসন' পত্রিকার রিপোর্ট, কলকাতা: পঃব সরকার সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, ১৯৮৭।

[57] ইউ সি আর সি রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট, ২০১৫।

[58] সুজন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম: বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৮৭।

এভিকশন বিলটি 'Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorized Occupation of Land Bill, 1951' নামে রাজ্যসভায় পাস হয়। বিভিন্ন কলোনির স্বীকৃতি প্রদান, জমির উপর স্বাধীন অধিকার, গৃহ নির্মাণের জন্যে ঋণ দানের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে ইউ সি আর সি এবং উদ্বাস্তুদের যৌথ উদ্যোগে সভা করে হয়। এতে যোগদান করেন জ্যোতি বসু, অমর মজুমদার, চিত্ত বসু, এস পি ব্যানার্জী।

উদ্বাস্তু রাজনীতিতে মূল নিয়ন্ত্রকের কাজ করেছিল কমিউনিস্ট দল এবং ইউ সি আর সি ছিল এদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইউ সি আর সি'র আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কমিউনিস্টরা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিল।

ইউ সি আর সি'র নির্মাণে কয়েকটি সংগঠন উল্লেখযোগ্য অবদান কায়েম করেছিল। যারমধ্যে প্রধান ছিল 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ'।[59] উল্লেখ্য, দক্ষিণ শহরতলীর বাস্তুহারা সমিতি, উত্তর কলকাতা বাস্তুহারা সমিতি, আঞ্চলিক স্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কলোনি কমিটি গুলি, বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল, কমিউনিস্ট পার্টি, সি পি আই, হিন্দু মহাসভা- এই দলগুলি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে নির্মিত হয়েছিল ইউ সি আর সি।[60] পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে, ইউ সি আর সি'র প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল- ইউ সি আর সি হল- 'Refugee front of the Communist Party'।[61] ইউ সি আর সি'র মধ্যে দিয়ে সি পি আই কলোনিগুলিতে তীব্র প্রচার ও সংগঠন নির্মাণ করেছিল। শুধু তাই নয়, ইউ সি আর সি কে উদ্বাস্তু কলোনিতে 'কমিউনিস্ট পার্টির ভোটের যন্ত্র' বলা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ বন্ধ করার প্রসঙ্গে একাধিক আন্দোলন করেছিল ইউ সি আর সি। ১৯৫৩ সালের ১৫ই মার্চ একটি কনভেনশনে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উদ্বাস্তু বিষয়ে।

- অবিলম্বে সরকারকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কোনো উদ্বাস্তু কে কোনো কলোনি থেকে জোর করে বা বলপূর্বক উৎখাত করা যাবে না।
- যেকোনো কলোনির স্কুল গুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি সহায়তা প্রদান করতে হবে।

---

[59] বিমান সমাদ্দার, *শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনি: আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান (১৯৪৭-১৯৭৭)*, কলকাতা: এলফাবেট বুকস, ২০২৩, পৃ. ৭৮।

[60] তদেব, পৃ. ৮০।

[61] তদেব, পৃ. ৮৩।

- ১৯৫১ সালের এভিকশন বিল বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

১৯৫৪ সালে আগস্ট মাসে নেতাজি নগরে ইউ সি আর সি'র দ্বিতীয় সন্মেলন হয় এবং এই সময়ে ১৪৯ টি জবরদখল কলোনিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৭ তে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে ইউ সি আর সি'র চতুর্থ সন্মেলনে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে বলা হল- 'উদ্বাস্তুরা যে পরিবেশের সাথে পরিচিত সেই পরিবেশেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে'।[62] পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের পক্ষে কিছু প্রস্তাব সরকারকে দেওয়া হয়। যেমন -

- জবরদখল কলোনি গুলির দলিল প্রদান
- নতুন জবরদখল কলোনিগুলির সরকারি অনুমোদন ও ঋণ মুকুব।

ইউ সি আর সি'র কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল, যার উল্লেখ না করলে সমগ্র আলোচনাটা পরিপূর্ণতা পায় না। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার বাইরে গিয়ে ইউ সি আর সি নিজের কাজ করতে পারেনি।[63] এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। পরবর্তী সময়ে জবরদখল কলোনির জমির দলিল বা 'অর্পন পত্র' উদ্বাস্তুদের হাতে তুলে দেওয়া চালু হলে, উদ্বাস্তু কলোনিতে ইউ সি আর সি'র গুরুত্ব কমে যায়। সেই জায়গায় 'কলোনি কমিটি' নিজের গুরুত্ব কায়েম করে। এইভাবে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন উদ্বাস্তুরা নিজেদের অধিকারের আন্দোলনের দিশা খুঁজে পেয়েছিল আবার অন্যদিকে কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এখানেই এই সম্পর্কের গুরুত্ব।

৩.৮ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি আঞ্চলিক আদি অধিবাসী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া:

দেশ বিভাজনের পরেও এমন বহু মুসলমানরা ছিলেন যাঁরা পশ্চিমবঙ্গেই থেকে গিয়েছিলেন। কলকাতা, মালদহ, মুর্শীদাবাদ- এই জায়গাগুলিতে এদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এই মুসলমান যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা কিভাবে অভিবাসিত হয়ে আসা উদ্বাস্তুদের দেখেছিলেন তা প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ্য, এই মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কলোনি নির্মাণের কাজে, পারস্পারিক জমি বা বাড়ি বিনিময়ের মাধ্যমেও এঁরা নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

[62] ইউ সি আর সি-র দ্বাদশ রাজ্য সন্মেলনের প্রতিবেদন, ১৯৭৭।

[63] প্রশাসনিক রিপোর্ট, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দিয়েছিল উদ্বাস্তুদের হিতার্থে।[64] এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। কামালগাজি পেয়ারাবাগান উদ্বাস্তু কলোনি অঞ্চল ছিল মুসলমানদের। বর্তমানেও এই অঞ্চলে প্রচুর মুসলিম পরিবার রয়েছে। যদিও অধিকাংশ জমি বিনিময় করে বা বিক্রি করে এখান থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এই অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে নানা তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, আঞ্চলিক যারা আদি মুসলমান অধিবাসী ছিল তারা কামালগাজি লস্করপুর পেয়ারাবাগান উদ্বাস্তু কলোনি নির্মানে প্রতি ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।[65] কম দামে, কখনো বিনামূল্যে জমি দান করেও এরা উদ্বাস্তুদের সাহায্য করে। সন্তোষপুর বিধান কলোনিতেও এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে এখানে কোনো মুসলিম পরিবার নেই। কিন্তু এখানকার প্রচুর পুরোনো বাড়ি, জমি ছিল আঞ্চলিক আদি অধিবাসী মুসলমানদের। বিধান কলোনি নির্মাণের সময়ে, এই মুসলমানরা নিজেদের প্রচুর জমি এবং পুরোনো বাড়ি উদ্বাস্তুদের জন্য দান করে। উদাহরণ স্বরূপ , বর্তমান কলোনির স্কুল 'ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়' একজন মুসলমানের দান করা জমির উপরেই গড়ে উঠেছিল ১৯৫০ এর দশকে।[66] এছাড়াও বিজয়গড় কলোনি, আজাদগাড় কলোনিতেও এমন বহু মুসলমান ছিল যারা উদ্বাস্তুদের প্রতি নিজেদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে লুৎফর রহমানের নাম উঠে আসে। যিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কলোনি গড়ার কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নিতেন সকলের। নিজেস্ব রেশন দোকান থেকে বিনামূল্যে উদ্বাস্তুদের চাল, ডাল দিয়ে সাহায্য করতেন। একজন সহমর্মী প্রতিবেশী ছিলেন তিনি।[67]

উল্লেখ্য, অভিবাসনের পর কলোনি স্থাপনের সময়ে বহু মুসলমানরা মূলত জমি বিনিময় করে নতুন করে বসতি নির্মাণ করেছে শহরের মুসলিম সংখ্যাধিক্য অঞ্চলে।কিন্তু বর্তমানেও তাদের সাথে উদ্বাস্তু অধিবাসীদের সু-সম্পর্ক বজায় রয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও আজও এরা একে অপরের প্রতিবেশী।

এই অধ্যায়ে উদ্বাস্তু সমাজ সংস্কৃতিকে যেমন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে আবার উদ্বাস্তু সমাজের জটিল দ্বন্দ ও সম্পর্ক বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই জটিলতার একটা বৃহৎ

---

[64] মণিকান্ত হালদার, [৬৩ পেয়ারা বাগান কলোনি, কামালগাজি]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৪.০৯.২০২২।

[65] চন্দ্রানী সাহা, [৭২ পেয়ারাবাগান কলোনি, কামালগাজি]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৪.০৯.২০২২।

[66] বাবুল নস্কর, [৬৮ সন্তোষ্পুর বিধান কলোনি]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০৫.০১.২০২৩।

[67] শশাঙ্ক মজুমদার, [৭৪, বিজয়গড় কলোন]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ০২.০৩.২০২৩।

অংশ জুড়ে যেমন আছে উদ্বাস্তু এবং কলোনির আদি অধিবাসীদের মধ্যেকার জটিলতা দ্বন্দ আবার আরেকদিকে রয়েছে উদ্বাস্তু সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বান্দিকতা। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে উদ্বাস্তু নারী সমাজের একটা পৃথক স্থান রয়েছে। যে নারী সমাজ উদ্বাস্তু কলোনির যেকোনো ক্ষেত্রেই এক গুরুত্বপূর্ন অবদান কায়েম করেছিল। তাই সর্বশেষ অধ্যায়ে নারী প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নারী সমাজের জটিলতা, দ্বান্দিকতা কেমন ছিল উদ্বাস্তু অভিবাসনকালে তাই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকট: নির্বাচিত সাহিত্য ও স্মৃতিতে

ডাঃ আম্বেদকর বলেছিলেন 'কোন সমাজের মহিলারা কতটা এগিয়েছেন তা দিয়েই আমি ঐ সমাজের প্রকৃত প্রগতির পরিমাপ করতে পারি'।[1] এই একই কথা অনেক আগে ১৮১৭ সালে জেমস মিল তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছিলেন, যে কোনো সমাজের সভ্যতার মান নির্ভর করে সেই সমাজে নারীর অবস্থানের উপর। অর্থাৎ সমাজে নারীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সামাজিক পরিমন্ডলে বিশেষ করে দেশ বিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসনের ঘটনা প্রবাহকালে, নারীর সামাজিক পরিচিতি কী ছিল - তা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র।

দেশ বিভাজনের আগে এবং দেশ বিভাজনের পরে, নারীদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনে বড় ধরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে - যা আলোচনা সাপেক্ষ। পুরুষের দেশান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরী হতে হয়েছে নারীকেও, পূর্ববাংলার অন্দরমহলে, ঘোমটার নীচে - যে নারীর জীবন সীমাবদ্ধ ছিল, পশ্চিমবাংলায় আসার পর সেই নারীর জীবন কীভাবে বদলে যেতে শুরু করেছিল আর সেই বদল কেমন ছিল, এই বদল কি খুব সহজে এসেছিল? কিংবা নারীদের জন্য এই বদল কি সুখকর হয়েছিল? পুরুষরা কেমন চোখে দেখেছিল নারীর এই বদলে যাওয়াকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা যেমন প্রয়োজন একইভাবে, কলকাতা বা শহরাঞ্চলের কলোনির উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে শহর থেকে দূরে বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতে যে অধিকাংশ দরিদ্র উদ্বাস্তু মহিলারা ছিলেন তাদের উভয়ের জীবন চর্চায় কি কোনো পার্থক্য ছিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা দরকার।

সীমাবদ্ধ আলোচনার প্রেক্ষিতের বাইরে গিয়ে 'উদ্বাস্তু নারী'কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে 'উদ্বাস্তু নারী' জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে উদ্বাস্তু নারীর প্রসঙ্গটি সাহিত্যের আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই উদ্বাস্তু নারীর সমগ্র জীবনচর্যা কে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিত নির্মাণের সাহিত্যকে

[1] অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী, ড কৈলাশপতি সাহা, *দেশভাগঃ ইতিহাস ও অভিব্যক্তি,* কলকাতা: সোপান, ২০২১, পৃ. ৫৬

যেমন ব্যবহার করা হয়েছে একইসাথে স্মৃতিকেও ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্বাস্তু নারী শৈশব, শিক্ষা, পারবারিক জীবন, জীবিকা এবং রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঠিক কেমন ধরণের প্রেক্ষিত নির্মাণ করতে পেরেছিল সেটাই এই আলোচনাতে প্রাসঙ্গিক।

দেশবিভাজন নারী সমাজকে বদলে দিয়েছিল। তারা বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে এসেছিল, উপার্জনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। উল্লেখ্য, ক্যাম্পের উদ্বাস্তু পুরুষরা তাদের পরিবারের মহিলাদের যৌনতাকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে নারীদের কথা ভাবা হয়নি। এর থেকেই জন্ম হয়েছিল এক সচেতন নারী সমাজের, যারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল।

উর্বসী বুটালিয়া তাঁর বই '*The Other side of Silence'* এ বলেছেন দেশবিভাজন পর্বে তৎকালীন পরিস্থিতিতে শিশু, নারী কিংবা নিম্নশ্রেণীর নারীদের নিয়ে আলোচনাতে যথেষ্ট ব্যাবধান থেকে গিয়েছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যাবধান রাখা হয়েছেছিল। তাঁর কথায়, 'When women narrate the nation, they do so rather differently than men. In men's narratives of the nation, women are often different: the need to keep the family together, to contain grief, to put closures on unexplained deaths, to try and somehow contain the violence that such a situation inevitably inleashes.'[2]

বর্তমান সময়কালে তিস্তা দাসের বই '*Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*'-এ উদ্বাস্তু মহিলা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়।[3] উদ্বাস্তু কলোনি এবং উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাসকারী মহিলারা তার আলোচনাতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তার মতে, অভিবাসন যদিও উদ্বাস্তু নারীকে বাড়ির বাইরের জগতের অনেকটা কাছাকাছি এনে দিতে পেরেছিল কিন্তু চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সীমাবদ্ধতা মহিলাদের স্বাধীনসত্তাকে বারংবার আড়াল করে দিয়েছে যা তাদেরকে স্বাধীন হতে দেয়নি। একদিকে, ক্যাম্পের মহিলারা যেমন সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছে আবার অন্যদিকে, কলোনির মহিলারা বিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছে, পড়াতে গিয়েছে, উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য- বিদ্যালয় নির্মাণের কাজে, পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বিভিন্ন সময়ে -

[2] Urvashi Butalia, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition India*, Penguin Publication, 2017, p.56
[3] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*, London: Routledge Publication, New York, 2023, p.160

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে - লড়াই করেছে। তার আলোচনাতে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে পরিচিত হয়েছি- যার থেকে আমরা ক্যাম্পের উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে কলোনির মহিলাদের মধ্যেকার পারস্পারিক কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারি- যা উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য কে বুঝতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।[4]

অর্চিতা বসু গুহ রায় চৌধুরি '*Economic and Political Weekly*'[5]-তে উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন কিন্তু তার এই আলোচনা কেবলমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু উদ্বাস্তু ভদ্র মহিলাদের মধ্যে করা সমীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'বাঙালি মহিলা' কিংবা 'উদ্বাস্তু মহিলা' এই কথাগুলো উচ্চারণের সময়ে একটা বৃহৎ পরিসরকে মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ বাঙালি উদ্বাস্তু মহিলা শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের হিন্দু উদ্বাস্তু ভদ্রমহিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এর একটা বহুমাত্রিক দিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর উচ্চবর্ণের নারীরা সমাজ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি নির্মাণের সুযোগ পেলেও - নিম্ন বর্ণের উদ্বাস্তু মহিলাদের সেই সুযোগ এত সহজে আসেনি। কিন্তু একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে লড়াইয়ের পথ কঠিন হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র নারী সমাজের কাছে একটা 'আত্ম পরিচিতির জগৎ' নির্মাণের দরজা খুলে গিয়েছিল। বিভাজনে একদিকে নারী যেমন হারিয়ে গেছে আবার অন্যদিকে নারীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জীবনে টিকে থাকার লড়াইয়ে। মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কাজের সন্ধান করেছে। শহুরে সংস্কৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন অনুভব করেছে প্রতি মুহূর্তে। এরূপ পরিস্থিতিতে নারী সমাজের বদল প্রয়োজন ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে সাহিত্য এবং স্মৃতি'র ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নারী সমাজকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

[4] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal,* p.165
[5] Archita Basu Guha Ray,'Economic and Political Weekly', pp.2

সুনন্দা শিকদারের 'দয়াময়ীর কথা'[6] উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদ্বাস্তু শিশু তার শৈশবকালে কেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল দেশবিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসন কালে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'দয়াময়ীর কথা'।

হিন্দু পরিবারে একটি শিশুর বেড়ে ওঠা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সে তার জীবনে কীভাবে বিপর্যয়ের দিন গুলিকে উপলব্ধি করেছিল তাই নিয়েই এই আলোচনা। একটি শিশু তার মা কে ছেড়ে তার শৈশব কাল কাটিয়েছিল পূর্ববাংলায় তার পালিতা মা আর বাড়ির কাজের লোক মাজমের কাছে।[7] দেশবিভাজনের উত্তাল পরিস্থিতিতে, দয়াময়ীকে কলকাতায় তার মা ও বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এক লহমায় তার জীবন বদলে যায়।

পূর্ববঙ্গ থেকে যখন একে একে তাদের প্রতিবেশীরা তাদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল, সেই পরিস্থিতিতে তাদের কিছু কথা তার মনে রেখাপাত করে। সেগুলি তুলে ধরা হল। 'ওগো, চলি, জন্মের মতো, যদি কোনও অপরাধ কইরা থাকি মাপ কইরা দিয়ো'[8]। আবার আরেকজন বলেছেন 'ওরে বুড়ি, যাইতেছি সারাজীবনের মতো। গাঁওয়ের কারুর সঙ্গে আর তো দেখা হইবে না। হিন্দুস্থানে গেলে তুই দেখা করিস'। '[9] কাছের পরিচিতজনদের চলে যাওয়া দয়াময়ীকে ব্যথিত করেছিল।

দয়াময়ী প্রতিক্ষণে বুঝতে পেরেছিল কোনো একটা কারণে তাদেরকেও নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গাতে চলে যেতেই হবে। কিন্তু এই চলে যাওয়াটা তার কাছে ছিল যন্ত্রণার। তাই সে প্রশ্ন করে, 'ও দ্যাশো যাওনের ঠ্যাকা কী মা? আমার এই দ্যাশই ভাল।'[10] উদ্বাস্তু শিশু ও নারী তার অন্তরের জমে থাকা কান্না, বিষাদ ও নিদারুণ কষ্টকে ভুলে যেতে পারেনি। তাই দেশত্যাগের বহু পরেও 'হারিয়ে যাওয়া দেশ' তার স্মৃতিতে অটুট থেকে গিয়েছে। দেশবিভাজনে, উদ্বাস্তু অভিবাসনে একটি শিশুর অভিব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনাতে।

---

[6] সুনন্দা শিকদার, *দয়াময়ীর কথা,* কলকাতাঃ গাংচিল, ২০০৮, পৃ. ১২

[7] তদেব, পৃ. ১৩-১৪

[8] তদেব, পৃ. ১৭

[9] তদেব, পৃ. ২৩-২৮

[10] তদেব, পৃ. ৩৪

৪.১. শিক্ষা

উদ্বাস্তু নারীদের জীবনে শিক্ষার একটা পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। তবে, নারী সমাজও উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র-এ সীমাবদ্ধ ছিল। তাই একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে উদ্বাস্তু পরিবারের প্রতিটি কন্যা সন্তান কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ কিংবা বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। নারী শিক্ষা মূলত বর্ণ গত ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ এমন পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।[11] মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বকে মনে রেখেই সমগ্র ১৯৫০-৬০ এর সময়কাল ধরে প্রধাণত শহরাঞ্চলের প্রতিটি কলোনিতে একটি করে ছেলেদের ও একটি করে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। 'যাদবপুর সম্মিলিত উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয়', 'যাদবপুর বিজয়গড় শিক্ষায়তন', 'আর্দশ বালিকা শিক্ষায়তন', 'ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়', 'বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, শহরাঞ্চলের কলোনিগুলিতে যেমন মেয়েরা পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিল। বহু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শহর থেকে দূরে কুপার্স ক্যাম্প, চাঁদমারি ক্যাম্প, গয়েশপুর বেদীভবনের মতন ক্যাম্পগুলিতেও মেয়েদের জন্য স্কুল গড়ে উঠেছিল।[12]

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানকে বোঝার জন্য এখানে কিছু সাহিত্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব- পশ্চিম' উপন্যাসটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।[13] উদ্বাস্তু নারীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন—'উমা বদলেছে, সাগর বদলেছে, বদলেছে তাদের রুচি, স্বভাব ও সংস্কার। ছিল মাটির মানুষ, ভিতরে পাথরের খাদ মিশানো লোহার খবর রাখত না। পুড়ে পুড়ে সেই লোহা ইস্পাত হয়। মানুষ না, তারা যেন ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার এক একটা ফলা।'[14] উপন্যাসের কাহিনিতে 'উমা' একটি গুরুত্বপূর্ন চরিত্র। পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে বাল্যবিধবা উমাও দেশত্যাগ করে। আর পাঁচ জন বাল্যবিধবার মতো সেও নিয়মিত গোপালের পুজো করে, সাদা থান পরে আর নিরামিষ আহার করে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তিলকনগর কলোনির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, এস.এস.সি (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ

---

[11] সমীক্ষা, সন্তোষপুর বিধান কলোনি, রাম মজুমদার, ৪. ৭.২০১৯

[12] তদেব

[13] তদেব

[14] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্ব- পশ্চিম,* কলকাতা: আন্নদ পাবলিকেশন, পৃ. ২৩

করে। ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার আশায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে। একটা সময়ে যে উমার কাছে ঠাকুর-দেবতাই ছিল প্রধান অবলম্বন, পরবর্তীতে সেই উমার জীবনেও পরিবর্তন আসে। তাই পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে, আগের মতন করে 'নাড়ুগোপাল'কে ডাকার পরিবর্তে সে নিজের শিক্ষা নিয়ে, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে।

পরিবারের পাশে দাঁড়াতে প্রয়োজন ছিল নিজে শিক্ষিত হওয়া। তা বুঝতে দেরী করেনি 'উদ্বাস্তু' সমাজের মেয়েরা। অভিবাসন, অনাহার, দারিদ্র্য, কঠিন পরিস্থিতি 'উমা'র মতন বহু উদ্বাস্তু মেয়েদের বাস্তবমুখী করে তুলেছিল। এই উপন্যাসের শেষে 'নির্মলের মা' তার ছেলের সঙ্গে উমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে উমা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কারণ উমার মনে হয়েছিল 'সুরী' নামক একটি আশ্রিত মেয়েদের কবল থেকে ছেলেকে বাঁচাতেই তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।[15]

উদ্বাস্তু নারী কেন্দ্রীক আরেকটি উপাদান সুমনা দাস সুরের- 'দেশভাগঃ স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা'।[16] মাত্র ৬৩ পাতার একটি ছোট্ট বইতে রচিত হয়েছে উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েদের স্মৃতি কথা, যার মধ্যে মিশে আছে মেয়েদের লড়াই, প্রচন্ড বিপর্যয়ের দিনেও ঘুরে দাঁড়ানোর এক সুন্দর লেখনী।[17] এখানে মূল চরিত্র একজন মা এবং তার মেয়েরা। একজন উদ্বাস্তু মা তার মেয়েদের নিয়ে নানান বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে, প্রবল কঠিন পরিস্থিতিতেও কিভাবে নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন এবং মেয়েদের 'পড়াশোনা' করিয়েছিলেন- এই আলোচনা সে প্রসঙ্গে। ঢাকা থেকে অভিবাসিত হয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাদের জায়গা হয় কৃষ্ণনগরের একটি পোড়ো বাড়িতে। সেই বাড়িতেই শুরু হয় তাদের জীবনযন্ত্রণার নতুন অধ্যায়। কিন্তু সেই পরিস্থিতেও মেয়েদের পড়িয়েছেন। বিপরীত পরিস্থিতির কাছে হার না মেনে এই পরিবারের 'উদ্বাস্তু মেয়েরা' স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, চাকরী করেছি। শুধু তাই নয়, বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলেও- সন্তান কোলে নিয়েও তারা পড়াশোনা করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটিতে একটি বংশ তালিকা দেওয়া হয়েছে – তা তুলে ধরা হবে আলোচনার শেষে।

---

[15] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্ব-পশ্চিম,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ২৪-২৫

[16] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* কলকাতা: গাংচিল, ২০২২, পৃ. ১

[17] তদেব, পৃ. ২

মা, একমাত্র পুত্র সন্তান ও ছয় মেয়ে - সরযূবালা, কানন, কমলা, বিমলা, অণিমা ও মালা- এদের নিয়ে এই উদ্বাস্তু পরিবার।[18] দেশবিভাজন বা উদ্বাস্তু অভিবাসনের ভয়াবহতা এই পরিবারকে ভাঙতে পারেনি। পরিবারের মেয়েরা স্কুলে গিয়েছে, পড়াশোনা করেছে আবার সংসারের প্রয়োজনে প্রতিমুহূর্তে একে অপরের পাশে থেকেছে।

পরবর্তীতে তারা কলকাতাতে নিজেদের বসতি নির্মাণ করে। কিন্তু কলকাতার শহুরে জীবন তাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছিল, 'খাঁচায় আটকে থাকা জীবনের' ন্যায়'।[19] শহরকেন্দ্রীক জীবন অপেক্ষায় কৃষ্ণনগরের পরিবেশ তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। অভিবাসন জীবনে পরিবর্তন আনলেও, সেই পরিবর্তনকে ভালোভাবে দেখেছে এই 'উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েরা'। তাই পরিবারের এক সন্তান অণিমা বলেছে 'পূর্ববাংলার ঢাকায় তাদের জীবন নিজ আত্মীয়বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল'।[20] আক্ষেপের সুরে সে বলেছে 'ওখানে থাকলে আমাদের জীবন ওই রকমই হত। হয়তো অনেক বড়ো বাড়িতে থাকতাম, গায়ে অনেক গয়না থাকত, কিন্তু সেটাই তো সব নয়। পড়াশোনা করার তো একটা আনন্দ আছে, কৃষ্ণনগরে থাকতে সেই আনন্দটাই পেয়েছিলাম।'[21] আবার এই একই পরিবারের আরেক উদ্বাস্তু মেয়ে মালার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে তার জীবনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে বলেছে-' ...কত অভিজ্ঞতা হল জীবনে, কত মানুষের সঙ্গে মিশলাম, কত কিছু শিখলাম। চোখের সামনে মা কে দেখলাম লড়াই করতে। দেখলাম, ভয় না পেয়ে শেষপর্যন্ত কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়- এ সবেরই তো মূল্য আছে, এ সবই তো রয়েছে আমাদের মধ্যেও। জীবনের অনেক কঠিন সময়েও আমরা হেরে যায়নি, ভেঙে পড়ি নি। আর শত দুঃখ- কষ্টের মধ্যেও আনন্দ ভুলে যায়নি, হাসতে ভুলে যাইনি। বাড়ি গয়না গেছে ঠিকই, কিন্তু নতুন দেশে এসে যেভাবে বাঁচলাম, যা পেলাম তা অনেক'।[22] তাদের এমন বক্তব্যে স্পষ্ট 'উদ্বাস্তু' জীবন তাদেরকে ভেঙে দিতে পারেনি। বরং নতুন করে তারা নিজেদের গড়তে পেরেছিল।

---

[18] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ১২

[19] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ১৩-১৪

[20] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ১৫

[21]সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ১৫-১৬

[22] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ২০

৪.২. পারিবারিক জীবন

উদ্বাস্তু পরিবার ও নারী প্রসঙ্গকে বুঝতে এক গুরুত্বপূর্ণ লেখা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানগর'[23] উপন্যাসটি। যে নারী 'অন্দর মহলের' সাংসারিক জীবনে সীমাবদ্ধ, বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে কিভাবে রক্ষণশীল পরিবারের 'স্ত্রী' তার পারিবারিক, সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কর্মক্ষেত্র জগতে প্রবেশ করেছিল, সেই এই আলোচনা। এই গল্পে আমরা পরিচিত হয়েছি প্রিয়গোপালবাবুর সাথে যিনি একেবারে নিঃস্ব হয়েই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। দেশবিভাজনের কারণে এবং উদ্বাস্তু জীবনে চরম অর্থ সংকট দেখা দেয় তার পরিবারে। মনের মধ্যে একাধিক জটিলতা ও অনিচ্ছা সত্বেও নিজ ছেলের বউয়ের কর্ম জীবনে প্রবেশ সে মেনে নেয়। পুত্রবধূ আরতি ক্যানিং স্ট্রিটে ' মুখার্জি অ্যাণ্ড মুখার্জি' ফার্মে শুরু করে তার কর্ম জীবন।[24]

মনের মধ্যে থাকা অন্ধ আভিজাত্যকে পুষে রাখার চেয়ে, বাস্তব সমস্যা সমাধানেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল স্বামী সুব্রতর পুরুষ বিবেক। কিন্তু 'বাড়ির বউয়ের' এমন কর্মজীবন মেনে নিতে দ্বিধা হয়েছিল প্রিয়গোপাল মহাশয় ও তাঁর স্ত্রীর। তাই স্ত্রীর চাকরির খবর সুব্রত যখন তার বাবাকে শোনাতে যায়, তখন পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন—'আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব?.... আমাদের বংশে ও সব কোনও দিন হয়নি, হবেও না।'[25] কিন্তু সংসার কিভাবে চলবে এই প্রশ্নের উত্তর তার কাছে ছিল না।

পারিবারিক জীবনে 'উদ্বাস্তু নারী'র সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায় জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলালের 'দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক-নারী' তে।[26] এখানে আমাদের সাথে পরিচয় হয় সুলেখা ঘোষের। উদ্বাস্তু নারী সুলেখা এবং পারিবারিক জীবনে তার গুরুত্বকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই অংশে। মাত্র তেরো বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলে শুরু হয় তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। স্বামী সেভাবে কোনো কাজ করত না। তিনটি সন্তান নিয়ে কীভাবে সংসার চলবে

---

[23] Narendranath Mitra, *Mahanagar*, Kolkata: Jaico Publication House, 1968, p .54

[24] Narendranath Mitra, *Mahanagar*,p.56

[25] তদেব, পৃ. ৬৮

[26] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী*, কলকাতা: গাংচিল, ২০২১, পৃ. ৩১

বা অন্ন সংস্থানের উপায় হবে তা নিয়ে সমস্যা শুরু হয়য়। যার সমাধান করতেই কাজে যোগ দেয় আরেক উদ্বাস্তু 'স্ত্রী'। সংসার চালানোর দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।[27]

সন্তানদের জন্য অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে একজন মায়ের মন ও কর্তব্যের কাছে হার মেনেছিল নিজ সম্মান। কর্মজীবন শুরু হয় রঙ মিস্ত্রীর সাথে হেল্পারী হিসেবে। কিন্তু সেই সামান্য উপার্জনে তার একার পক্ষে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছেল। একদিকে যৎসামান্য আয়, অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে নানান রকমের কুপ্রস্তাব এড়াতে এই কাজ তাকে ছাড়তে হয়েছিল। কোনো উপায় না দেখে, বাধ্য হয়েই 'অন্যপথে' রোজগারে নামে সে। তার কথায়- 'পেটে যখন আগুন জ্বলে, তখন সমস্ত নীতিবোধ, মূল্যবোধ পুড়ে ছাই হয়ে যায়'[28] - আর তাই নিজের শরীরকে সে রোজগার করার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে শুরু করে। কলকাতার 'হাড়কাটা গলি' তে শুরু হয় তার জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়। উদ্বাস্তু পরিবারে নিয়ম শৃঙ্খলায় বেড়ে একটি 'উদ্বাস্তু মেয়ে' পরিণত হল একজন বারবণিতায়, পারিবারিক প্রয়োজনে।

পূর্ববঙ্গের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকা, একে একে সব হারিয়েও লড়াই করে টিকে থাকা এক উদ্বাস্তু পরিবারের মা জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে জয়ী হতে পেরেছিল। তার মনের জোরের কাছে হার মেনেছিল সময় ও কঠিন পরিস্থিতি।[29]

উল্লেখ্য, দেশান্তর মেয়েলি জীবনে আমূল বদল ঘটিয়েছিল। 'উদ্বাস্তু' পরিচয় নারী সমাজের পরিচিত ছবিকেও বদলে ফেলেছিল। উপরিউক্ত আলোচনাতে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সময় ও পরিস্থিতিতে নারীর 'মাথার ঘোমটা' সরে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল পরিবারের গড়ন, সদর-অন্দরের ব্যবধান, ঘর-গৃহস্থালির ধরন-ধারণ।[30]

নারী ও পুরুষের মধ্যেকার ব্যবধান কমে গিয়েছিল। উদ্বাস্তু জীবনে তৎকালীন পরিস্থিতিতে পুরুষের পৃথিবী আর মেয়েদের পৃথিবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।[31] খুব স্বাভাবিকভাবেই সময় পরিস্থিতি নারী ও পুরুষ সমাজের সীমাবদ্ধ চিন্তা চেতনার জগৎকেও

---

[27] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* কলকাতা: গাংচিল, ২০২১, পৃ. ৩১

[28] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* পৃ. ২৩

[29] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* পৃ .২৪

[30] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* পৃ. ২৫-২৬

[31] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* পৃ. ৩০

অনেকটাই বদলে দিতে পেরেছিল। মেয়েরা পাড়ি দিয়েছিল কর্মক্ষেত্রে। জীবিকা বা উপার্জন করা তাদের কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল। আর এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবিকার প্রসঙ্গটি।

৪.৩. জীবিকা

মেয়েদের জীবিকার প্রসঙ্গে সরকারি কর্মী, হাসপাতালের নার্স, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা, জনপ্রিয় অভিনেত্রী, যাত্রা দলের অভিনেত্রী, রঙ মিস্ত্রি, লেবার বা শ্রমিক, বেশ্যাবৃত্তি'র মতন প্রতিটি ক্ষেত্রই উঠে আসে।

উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু জীবনে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উদ্বাস্তু নারীকে পূর্ববঙ্গীয় সামাজিক বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে সংসারের তাগিদে কাজে নামতে হয়েছিল। কিন্তু মালা কিংবা অণিমার[32] মতন উদ্বাস্তু মেয়েরাও তৎকালীন সমাজে ছিলেন যাঁরা কিন্তু শুধুমাত্র বাধ্যতার জন্যই শহরের বুকে এসে কর্মজীবনে পা বাড়াননি। তাঁদের মনে পড়াশনা করা কিংবা নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা নিজের সম্মানের বিষয় ছিল। অন্যদিকে আবার সুতপার মতন মেয়েরাও ছিল।[33]

এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রাসঙ্গিক উপন্যাস মহীতোষ বিশ্বাসের 'উচ্ছিন্ন পরবাস'।[34] আলোচ্য উপন্যাসে বাধ্য হয়ে ঘরের মেয়েকে কাজে পাঠানোর চিত্র ফুটে উঠেছে। 'উমাপতি মাস্টার' পূর্ববঙ্গে বৃহৎ ও এক সমৃদ্ধ পরিবারের কর্তা ছিলেন। দেশ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে দুই সন্তান একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বাস্তু কলোনিতে এসে পৌঁছান। বয়সজনিত কারণে পারিবারিক দায়িত্ব নিতে অক্ষম হলে, তার মেয়ে বিনতিকে পারিবারিক দায়িত্ব নিতে হয়য়। ফলে সে বেশীদূর পড়াশোনা করতে পারেনি। বাবার প্রচন্ড আপত্তি সত্বেও সংসারের হাল ধরতে সে ট্রেনে করে অবৈধভাবে চাল নিয়ে কলকাতায় বিক্রি করার এক অভিনব পথ অনুধাবন করে, রোজগারের আশায়।[35] মেয়ের এমন কাজ উমাপতির দাম্ভিক ও অহংপূর্ণ মন মেনে নিতে পারেনি। কারণ সে তাঁর মেয়ের জন্য এক অন্য ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছিল। অন্যদিকে বিনতি প্রতিদিন পুলিশ, চেকারের

---

[32] সুমনা দাস সুর, *দেশভাগ: স্মৃতি যাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা,* পৃ. ১২

[33] জয়তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, *দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী,* পৃ. ৩০

[34] মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস,* কলকাতা: গ্রন্থতীর্থ, পৃ. ৩২

[35] মহীতোষ বিশ্বাস, *উচ্ছিন্ন পরবাস,* পৃ. ৪৩

নজর এড়িয়ে, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের কাজ করে গিয়েছে পরিবারকে বাঁচাতে। উল্লেখ্য, মেয়েদের উপার্জিত অর্থ সংসারের কাজে, নানান প্রয়োজনে ব্যবহার হতে শুরু করলে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতে মেয়েদের কথা বলার সুযোগ নির্মিত হয়ে। যে সুযোগ আগে মেয়েদের কাছে ছিল না।

নারীকেন্দ্রিক এই আলোচনাতে আরেকটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়, প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' তে। উদ্বাস্তু নারী জীবনের সংকট এখানে লক্ষ্য করা গিয়েছে। কয়েকজন মূল চরিত্র রয়েছেন। উজানী বুড়ী, হারান, কাপাসী, নিত্য ঢালী। দেশত্যাগের মধ্যে দিয়ে এক অনিশ্চিত পথে যাত্রা শুরু করে এরা। কোনো জায়গায় স্থিত হতে না পেরে শিয়ালদহ স্টেশনে, পাঁচ হাত জায়গা দখল করে, ইঁট দিয়ে নিজের জায়গা সুরক্ষিত করার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এদের জীবনের নতুন অধ্যায়। যে জীবনে ছিল না সুরক্ষা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, আব্রু কিংবা মান-সম্মান এবং নিশ্চয়তা।[36]

দীর্ঘদিন একসাথে একজায়গায় থাকার কারণে, সকলের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসে, পূর্ববঙ্গে ধর্ষিতা কাপাসীর জীবনের নানা সংকট লক্ষ্য করা যায়। মাতৃহারা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ, সেখান থেকে আন্দামান দ্বীপে জায়গা হয়েছিল নিত্য ঢালীর এবং সেখানেই উজানীর নাতি হারানের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। তারই সংস্পর্শে এসে অর্ধ উন্মাদ কাপাসী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলেও তাদের সেই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায় নি, মূল কারণ নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী ছিল ধর্ষিতা।[37] সর্বস্ব হারিয়েও, মনের ভিতরের জাত্যাভিমান, গোঁড়ামি এবং অহংবোধ মন থেকে দূর করতে পারেনি অনেকেই। তাই সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ভালোবাসার সম্পর্ক কে কিংবা একটি মেয়ের সেরে উঠে জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসাকে।

অন্যদিকে আরেকটি বাধা ছিল 'ভিন্ন জাত'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পেশা ও বৃত্তি অনুযায়ী যে জাত ব্যবস্থা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বজায় ছিল, দেশ বিভাজন কিংবা উদ্বাস্তু অভিবাসন সেই

---

[36] প্রফুল্ল রায়, *নোনা জল মিঠে মাটি,* কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৯, পৃ. ৩২

[37] প্রফুল্ল রায়, *নোনা জল মিঠে মাটি,* পৃ. ৩৩-৩৪

সীমারেখাকে কিছুটা হলেও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল।[38] পূর্ববাংলা থেকে অভিবাসিত হয়ে আসা প্রতিটি ব্যক্তির তখন কেবলমাত্র একটিই মূল পরিচয় নির্মিত হয়েছি তারা- 'উদ্বাস্তু'। কিন্তু কথায় আছে – 'বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না', তাই দেশবিভাজন সর্বস্ব কেড়ে নিলেও অনেকের মন থেকেই কিন্তু মান-অভিমান কিংবা অহংবোধকে কেড়ে নিতে পারেনি। আর সেকারণেই উদ্বাস্তু কিংবা কলোনি জীবনে স্থিত হয়েও, তারা জাত নিয়ে নতুন করে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে কিন্তু এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, খুব অদ্ভুতভাবে দাঙ্গার সময় হায়িয়ে যাওয়া মেয়ে কিংবা ধর্ষিতা মেয়ে অথবা মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসা মেয়ে যখন নিজ পরিবারে আসতে চেয়েছে তখন কিন্তু এমন বহু হিন্দু বাঙালি পরিবার ছিল যারা তাদেরকে ফিরিয়ে নেয় নি – কারন এই ফিরিয়ে নেওয়ার পথে তখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের অন্ধ গোড়ামি, অহংবোধ, জাত্যাভিমান। কিন্তু যখন নিরুপায় হয়ে দেশান্তরী হতে হয়েছে তখন কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্য হলেও এই জাত কিংবা জাতগত বোধকে ভুলে যাওয়া হয়েছে। উল্লেখিত উপন্যাসে –যেখানে দেখা গিয়েছে কখনো উজনীবুড়ি নিত্য ঢালীর বাড়িতে এসে নানা কথা শুনিয়ে গিয়েছে। আবার কখনো জাতের দোহাই দিয়ে ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে, 'নিত্যা তুই কি ভুল্যা গেলি তরা ঢালীর জাত। আমরা কাপালী যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগল চান আমাগো গুরু। ভিনজাতের লগে কি আমাগো বিয়া হয়, না হইতে পারে। হে ছাড়া—'[39] এই হে ছাড়া কথাটির মধ্য দিয়ে উজানীবুড়ি কাপাসীর অতীত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

৪.৪. রাজনীতিতে উদ্বাস্তু নারী

উপরিউক্ত আলোচনাতে সামাজিক, পারিবারিক প্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু নারী সমাজের সাথে পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির প্রেক্ষিতেও উদ্বাস্তু নারীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। যা এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক। কিভাবে উদ্বাস্তু অভিবাসন, কলোনি স্থাপনের মতন বিষয়গুলিতে উদ্বাস্তু নারীসমাজ নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান কায়েম করেছিল তা জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নারীর এক সংগ্রামী রূপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

---

[38] প্রফুল্ল রায়, *নোনা জল মিঠে মাটি,* পৃ. ৪০

[39] তদেব, পৃ. ৪৩

সরকারি জমিতে উদ্বাস্তুরা কলোনি স্থাপনের জন্যে উদ্যত হলে, পুলিশ বাধা দেয়। সেই সময়ে উদ্বাস্তু মেয়েরা দল বাঁধতে শুরু করে পুলিশের বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র কলোনি স্থাপনে প্রতিরোধ আন্দোলনেই নয়, উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের সচেতন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।[40] উল্লেখ্য, মহিলাদের সংগঠিত ও সমবেত প্রতিবাদের ক্ষেত্রে 'ইউ.সি.আর.সি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[41] সংঘবদ্ধ এই লড়াই নারীকে শক্তি জুগিয়েছে এবং নারীর আভ্যন্তরীণ চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের জায়গাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীর জবর দখল কলোনি নির্মাণে, রাজনীতিতে মহিলাদের অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্বাস্তু নারী-সমাজ কর্মী, রাজনৈতিক কর্মীর কাজ করেছে। তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠন বামফ্রন্ট দলের উদ্যোগে একাধিক রাজনৈতিক মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। যাদের উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো।[42] এই রকম রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে 'প্রগতি মহিলা সংগঠন', 'গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠন', 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নাম করা যেতে পারে। কয়েকজন মহিলার নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মনিকুন্তলা সেন, দোলনচাঁপা দত্ত, ইলা বসু, হাসি গুহ, অনুপমা চক্রবর্তী, নির্মলা বসু, কল্পনা বসু। এরা শুধুমাত্র উদ্বাস্তু রাজনীতির সাথেই যে যুক্ত হয়েছিল তা নয়, এরা সকলেই উদ্বাস্তু কলোনির নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাজেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। যেমন- মন্দির নির্মাণের কাজে, স্কুল নির্মাণের কাজে। কলোনির প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবার সময় মত ডোল পাচ্ছে কিনা সেটাও দেখত। আঞ্চলিকদের থেকে পুরোনো জামা কাপড় সংগ্রহ করে তা, কলোনির উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রদান করার কাজও এরা করেছে। পুরুষদের তুলনায়, মেয়েরা অনেক কম সময়ে আদি অধিবাসীদের সাথে বিশ্বাসযোগ্যতার ও সু সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল।[43]

---

[40] Prafulla kumar Chakrabarti, *The Marginal Men: The Refugees and the left Political syndrome in West Bengal*, kolkota : Naya Udyog, 1999, p.56

[41] Prafulla kumar Chakrabarti, *The Marginal Men*, p. 60

[42] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement* in *Bengal*, p.161

[43] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Benga*l, p.162

১৯৫২ সালের, সি পি আই পলিটব্যুরো থেকে একটি প্রতিবেদন বেরোয়। সেখানে মহিলাদের আন্দোলনকে 'মাল্টিক্লাস মুভমেন্ট' বলা হয়েছে।[44] দলের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয়সূচী নির্ধারণ করা হয়-

- নারী ও পুরুষের সম অধিকার, সমমর্যাদা।
- প্রতিটি উদ্বাস্তু সন্তানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- মহিলাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করা।
- যারা পীড়িত এবং ধর্ষিত মহিলা তাদের জন্য যথাযথ রিলিফ প্রদান করা।
- কো- এডুকেশন মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়।
- সর্বাপেক্ষা মনোযোগ প্রদান করা হয়েছিল মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর।

১৯৫০ সালে, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' (মার্স) নামে সি পি আই এর আদর্শে লালিত-রাজনৈতিক মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। এর দায়িত্বে ছিল, কমলা চ্যাটার্জী, মণিকুন্তলা সেন, এলা রেইড এবং রেণু চক্রবর্তী। মূলত কর্মদক্ষ শিক্ষিত, মধ্য- উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মহিলাদের একটা প্ল্যাটফর্ম নির্মিত হয় এর মাধ্যমে।[45] এই সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয় পুরুষেরা যেভাবে জনসাধারণের জন্য কাজ করে, তাদের এই মহিলা সমিতির কাজ হবে মহিলাদের আত্মরক্ষা ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করা। অপর্ণা ব্যানার্জী, গীতা মল্লিকের নাম পাওয়া যায়। যারা সচেতনভাবে এই দলের সাথে যুক্ত হয়। এরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলে, তার সাথে সাথে এদের একাধিক গোপন কেন্দ্র ছিল। যেখানে তারা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। বিভিন্ন উদ্বাস্তু জনসভায় এরা অংশগ্রহণ করে। এদের মূল লক্ষ্য ছিল 'শহরতলীর' উদ্বাস্তুদের অধিকারের দাবি জানানো।[46] চারজন মহিলাদের নাম পাওয়া যায়, যারা উদ্বাস্তু অধিকারের, জমি আদায়ের লড়াই করতে গিয়ে, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এরা হলেন- লতিকা, প্রতিভা, অমীয়, গীতা। ক্রমশই উদ্বাস্তু সমস্যা তাদের আন্দোলনে পরিণত হয়। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর ও টালিগঞ্জ অঞ্চলে, মার্সের জোনাল কমিটি হয় ১৯৫৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ইন্দুপ্রভা রায়

---

[44] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*, p.166-163

[45] Manikuntala Sen, *In Search of Freedom an Unfinished Journey*, Translated from the Bengali by Stree, Calcutta: Stree, 2001, p.74

[46] মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা,* কলকাতা: নবপত্র, পৃ. ৬৭

চৌধুরী'র বাড়িতে।[47] যেখানে সভাপতিত্ব করেন রেণু গাঙ্গুলী। কয়েকটি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়-

- কিভাবে দলে আরো নতুন সদস্য যোগ করা যায়।
- প্রতিটি কলোনিতে কিভাবে অধিক সংখ্যায় স্কুল নির্মাণ করা যায়।
- অধিকাংশ সময়ে, বাড়িতেই স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত কিভাবে জমি সংরক্ষণ করা যেতে পারে, স্কুল নির্মাণের জন্য- তা নিয়ে ভাবা হয়।
- তারা জানায়, তাদের কাজ সর্বসাধারণের জন্যে।

আরেকটি রাজনৈতিক সংগঠন নির্মিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইম্যান'। এরা কয়েকটি বিষয়ে কাজ করে-

- মহিলাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।
- প্রতি দশ হাজার জনের মধ্যে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- গণ শিক্ষার পক্ষে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়।
- এই বিষয়ে মহিলাদের বিশেষভাবে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়।
- এই সংগঠনটি একই সাথে কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ানগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করে।

৪.৫. ক্যাম্পে উদ্বাস্তু নারী ও তাদের আন্দোলন

দেশ বিভাজন, উদ্বাস্তু অভিবাসন ও পুনর্বাসনে ক্যাম্পের উদ্বাস্তু মহিলারা পিছিয়ে থাকেননি। ঘরের বাইরের জগৎ যাদের কাছে অজানা ছিল, তারাই নতুন জায়গায় এসে, নতুন পরিবেশে, ক্যাম্পের জীবনে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। টিটাগড়, ধুবুলিয়া, কুপার্সের মত ক্যাম্পগুলিতে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

[47] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*, p.161

মহিলারা সঙ্গবদ্ধ হতে শুরু করে। 'মহিলা বাস্তহারা সমিতি' নির্মিত হয়। ক্যাম্পের ভিতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মহিলাদের সম্মান রক্ষা, পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় বিভিন্ন সময়ে।

উদ্বাস্তু মহিলাদের এরূপ সংগ্রামী মনোভাব তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার মধ্যে ইউ সি আর সি ছিল অন্যতম।[48] এই ক্যাম্প ছাড়াও, ১ নম্বর টিটাগড় উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মহিলারাও একত্রিত হয়ে, প্রায় ৫০০ জনের একটা সমাবেশ করে। আঞ্চলিক স্তরে এর নেতৃত্বে ছিল কমলা তাতী। উদ্বাস্তু আন্দোলনে একজন পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তিনি উদ্বাস্তুদের পক্ষে, সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি জানিয়েছিল। যেমন-

- উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত রেশন সরবরাহ করতে হবে।
- শিশুদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকলকে উপযুক্ত ক্যাশ ডোল প্রদান করতে হবে।
- ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরিসেবা।
- পুরুষ অফিসারদের মহিলাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।

উল্লেখ্য, দেশবিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসন তৎকালীন নারী সমাজের উপর নিঃসন্দেহে একটা মিশ্রিত প্রভাব ফেলেছিল। এই দেশবিভাগ একদিকে নারী সমাজের স্বপ্নভঙ্গ ও লাঞ্ছনার কারণ হয়েছিল। আবার অন্যদিকে এই ঘটনাই তাদের জীবনে এক নতুন মোড় এনেদিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে শৈবাল মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক—'দেশ বিভাগের অভিশাপ জর্জরিত কোটি কোটি নিরাশ্রয় মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ালো, পরিচয়হীনতা-যা কাটাতে কাটাতে তারা যে নতুন আত্মপরিচয় তৈরি করল, তার নাম 'রিফিউজি কালচার'—উদ্বাস্তু সংস্কৃতি। নতুন সংস্কৃতির মূল কথা জোর যার, মুলুক তার। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, জীবনধারণ বদলে যেতে শুরু করেছিল'। এমন বদল ছিল জরুরী, যা বুঝতে দেরি করেনি উদ্বাস্তু নারী সমাজ। তাই যার কাছে জীবন যেমন রূপে ধরা দিয়েছে - তারাও তাদের নিজেদের মতন করেই নিজ জীবন বোধ দিয়ে সেই উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করেছে- কোনো পরিস্থিতিতেই তারা থেমে থাকেনি - পথ

[48] Manikuntala Sen, *In Search of Freedom an Unfinished Journey*, Translated from the Bengali by Stree, Calcutta: Stree, 2001, p.78

যেমনই হোক না কেন- তারা সর্বদা সামনের দিকেই এগিয়ে গিয়েছে। তাই একথা স্বীকার করে নিতেই হবে- পূর্ববাংলার ভয়াবহ লাঞ্ছনার কদর্য অভিজ্ঞতা, রেলের প্লাটফর্মে ও উদ্বাস্তু ক্যাম্প জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা, বাংলার নারী সমাজকে এক নতুন পথে, এক নতুন চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল।

উদ্বাস্তু ও কলোনি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক নারী, রাজনৈতিক কর্মী ও নেত্রী পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। মণিকুন্তলা সেন এক্ষেত্রে, কমিউনিস্ট পার্টির অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার কথা বলেছেন বারংবার –তার কথায় উদ্বাস্তু আন্দোলনে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠীই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থন পেয়েছিল - এরফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে - এই বিষয়ে আমি আগেও আলোচনা করেছি, আমরা দেখেছি - কিভাবে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে- উদ্বাস্তু নারীদের রাজনৈতিক নানান পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তাই একথা বলা যেতে পারে, ছিন্নমূল মানবদের দ্বারা কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য কলোনিগুলিই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

তৎকালীন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা বারংবার বলা হলেও – তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার যখন একটা বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে আন্দামান কিংবা মরিচঝাপি তে পাঠিয়েছিল এবং পুলিশ দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করেছিল, আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল- এই প্রসঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। সেখানে একটা চিরকালীন নীরবতা লক্ষ্য করা যায় বারংবার কলকাতা বা শহরকেন্দ্রীক উদ্বাস্তুর মতন করেই শহরকেন্দ্রী উদ্বাস্তু মহিলাদের নিয়েই রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মহিলাদের সমর্থনের বিষয়টা কিংবা পাশে এসে দাঁড়ানোর বিষয়টা সীমাবদ্ধ ছিল শহরের সামাজিক বৃত্তে- কিন্তু এমন সাহায্যের হাত কি তারা সকলের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছিল- না তা কিন্তু তারা করেনি – কারণ উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর আড়ালেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই মূল উদ্দেশ্যে ছিল বলেই আমি মনে করি - তারজন্যেই এত বিভাজন তখনও চলেছিল আবার এখনও চলছে- কিন্তু এ নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন তোলা হয়না - আবার প্রশ্ন তুললেও চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল - যেমন বিধানসভার বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু নীতি,

বিশেষত নারী ও শিশুর স্বার্থরক্ষায় চরম ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উঠে আসে। উদ্বাস্তু আন্দোলন দমনের নামে সরকারের দমন-পীড়নের সবচেয়ে বড়ো শিকারে পরিণত হয়েছিল নারী ও শিশুরা, ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ বিধানসভার একটি বিতর্কের অন্যতম বক্তা সুহৃদকুমার মল্লিক চৌধুরীর বক্তব্যে-তা প্রকাশ পায়। তিনি হালিশহর কেন্দ্রিক মল্লিকবাগ কলোনির শ্রীমতী রেণুবালা সরকার ও অনিমা দত্তের প্রসঙ্গ ব্যবহার করে বলেছেন- নারী ও শিশুদের উপর পুলিশের অত্যাচার ছিল অসহনীয়- পরিস্থিতি বিরূপ হওয়ার কারণেই বাধ্য হয়ে অধিকার রক্ষার তাগিদে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে তাঁরা এক হয়েছিলেন।

অনিন্দিতা ঘোষাল তাঁর নিবন্ধে ১৯৫৮ সাল থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের চরিত্রে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন। ঐ বছর থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনে মহিলাদের পৃথকভাবে অথচ সরাসরি অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। জনৈক পুলিশ অফিসারের লেখনী থেকে জানা গিয়েছিল যে, মহিলারা আলাদা করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, মিটিং-মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের দাবি জানিয়েছিলেন। এমনকি বর্ধমানে একটি ক্যাম্পে ১৯৫৮ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে 'Women's Refugees Day' পালিত হয়।[49]

পুলিশ ফাইলে বেশ কিছু উদ্বাস্তু আন্দোলনে নারীদের গৌরবময় ভূমিকার কথা উঠে আসে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে কাঁচরাপাড়া পলাশি উইমেন ক্যাম্পে শ্রীমতী প্রভাবতী দে নস্কর সরকারের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নীতির সামগ্রিক সমালোচনা করে বলেন যে, উদ্বাস্তুদের যেভাবে বলপ্রয়োগ করে দণ্ডকারণ্য পাঠানোর চেষ্টা করেছে, তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

অপর একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, বাঁকুড়ায় শ্রীমতী উষারানি ভট্টাচার্য, জানকী বিশ্বাস ও কনক মণ্ডল তাঁদের দাবিদাওয়া পুরণের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমসাময়িক সময়েই আবার 'টিটাগর মহিলা সমিতি'র মহিলারা দণ্ডকারণ্যে না গেলে সরকার ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেবে—এই হুমকির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন, যাই হোক দেশবিভাজন এই সকল রাজনৈতিক নারী সমাজের বা বিদ্রোহী নারী সমাজের জন্ম দিয়েছিল।

[49] Anindita Ghoshal, *Refugees, Borders and Identities: Rights and Habitat in East and Northeast India*, London: Routledge, p. 101

বাংলা সাহিত্যে যেমন উদ্বাস্তু নারীদের বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। আবার উদ্বাস্তু নারীদের স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়েও উদ্বাস্তু নারীর নানান দিককে আলোকিত করা যেতে পারে। গবেষণার কাজে যখন একাধিক কলোনি এবং ক্যাম্পগুলিতে সমীক্ষা করা হয়েছে, তখন উদ্বাস্তু মহিলাদের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এমন ভাবেই ৮৭ বছর বয়সী গীতা সাহার সাথে কথা বলে তাঁর 'উদ্বাস্তু জীবন' বিষয়ে ধারণা নির্মিত হয়। পূর্ববাংলার বরিশাল থেকে অভিবাসিত হলে তাঁর জায়গা হয় গয়েশপুর বেদীভবন পি এল ক্যাম্পে। পড়াশোনাতে তাঁর গভীর উৎসাহ ছিল। ভালো চাকরি করার ইচ্ছে ছিল তাঁর সাংসারিক নানান জটিলতা সত্বেও মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন।[50] কিন্তু পারিবারিক অভাবের কারণে তাঁকে কাজে নামতে হয়। পথিলিথ ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মনের সুপ্ত বাসনা যা অপূর্ণ থেকে গিয়েছে, সমীক্ষার সময়ে সে বিষয়ে তাঁর বারবার মনে পড়েছে। তাই জীবনে নিজের পছন্দ মতো কিছু না করতে পারায়, তাঁর শেষ জীবনও হতাশ ভাবেই কাটছে। যোগ্য কাজ না পাওয়ার আক্ষেপ, পরিস্থিতির শীকার হওয়ার আক্ষেপ আজও তাঁর স্মৃতিতে জীবন্ত। এক শিক্ষিত মনস্ক নারী- বারবার তাঁর হতাশা প্রকাশ করেছেন। সে শেষ জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছেন তাঁর গ্রামের বাড়ি পূর্ববাংলাতে। কিন্তু তারও উপায় না থাকায় তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে নিজ দেশে ফিরিতে না পাওয়ার হতাশা। কিন্তু সেই হতাশার থেকেও তাঁর জীবনের বড় আক্ষেপের কারণ- পড়াশোনা করেও যোগ্য কিছু না করতে পারার গ্লানি। নারী প্রসঙ্গ আলোচনাতে তাঁর এমন অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক।

উল্লেখ্য, একজন উদ্বাস্তু শিশু, বয়সের আগেই বড় হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে নিজের স্বপ্ন, আশাকে অবলীলায় ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু অনেক না পাওয়া আজও একজন উদ্বাস্তু নারীর অঝোরে ঝরে যাওয়া, চোখের জলের কারণ হয়ে থেকে গিয়েছে।

এই রকমই আরেকজন নারীর স্মৃতি কথায় উঠে আসে তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা। ৮০ বছর বয়সের সুরবালা হালদার তাঁর উদ্বাস্তু জীবনকে তুলে ধরেন, এই সমীক্ষাতে।[51]

---

[50] গীতা সাহা, [৫৪, পি এল ক্যাম্প, গয়েশপুর বেদীভবন], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২. ৯.২০২৩

[51] সুরবালা হালদার, [৬৪, কাঁচপাড়া, ৭ নম্বর গয়েশপুর কলোনি], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১২.২.২০২৩

উদ্বাস্তু জীবনে আশ্রয় পান ধুবুলিয়া ক্যাম্পে। ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি বলেন। বেশিদূর পড়াশোনা করেন নি, আঞ্চলিক ময়রা বাজার স্কুলে মাত্র কয়েক বছর পড়াশোনার পরেই, তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় গয়েশপুর কলোনির বাসিন্দা গোবিন্দ গৌড় মহাশয়ের সাথে। পেশায় তাঁর স্বামী ছিলেন একজন চাষি। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার।

ধুবুলিয়া ক্যাম্প জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেন। উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ আলোচনাতে তা প্রাসঙ্গিক। তাঁবু খাটিয়ে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় এই ক্যাম্পে। প্রথম দিকে সরকার থেকে চিড়ে আর আঁখিগুঁড় দেওয়া হত।[52] দিনের পর দিন এই খাবার খেয়ে আমাশা হয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে, মারা যায়। মারা গেলে, সেই দেহ কে কোনোমতে একটা বাঁশে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্যাম্প ছিল কিন্তু পর্যাপ্ত রিলিফের ব্যবস্থা সরকার থেকে সময় মতন করা হতো না, খাদ্য, বস্ত্রের অভাব দেখা গিয়েছিল। ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর সংখ্যা যখন ক্রমশ বাড়তে থাকল, তখন থেকে চিড়ে-গুড়ের পরিবর্তে আতপ চালের রান্না করা খিচুড়ি দেওয়া হয়েছিল। এই ক্যাম্পে অনেক পরে সরকার থেকে চাল, গম এবং বাচ্চাদের জন্য প্যান্ট-জামা, বড়দের জন্য ধুতি, কাপড় দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু এর কোনোটাই তারা পাননি বলেই জানান। সুরবালা দেবীর ভাষায়, ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হয়েছিল- 'তোমরা চাষের লোক, মাটির জায়গায় যাও- চাষ করে খেতে পারবে।'[53] সরকার থেকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু কোনো রিলিফ তারা সরকার পক্ষ থেকে না পাওয়ায়, নিজেরাই নানান কাজে যুক্ত হন। যেমন – মাটি কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার- এসকল কাজে আঞ্চলিক এদেশীয়দের সাথে তারাও মিলেমিশে কাজ করেছেন। অর্থাৎ উদ্বাস্তু এবং তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল।

তার স্বামী মারা যায় প্রায় তিরিশ বছর আগে, বর্তমানে তিনি তার ছেলেদের সাথেই রয়েছেন, সরকারি বিধবা ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজের ছেলেদের উপর কিন্তু পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল হতে চাননি। ছেলেদের না জানিয়েই, এই বয়সেও কাজে যোগ দিয়েছেন। নিজের মনোবলকে ভাঙতে দিতে চাননি। গেঞ্জী কেটে শোলতে বানানোর কাজ করছেন

[52] সুরবালা হালদার, [৬৪, কাঁচপাড়া, ৭ নম্বর গয়েশপুর কলোনি], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১২.২.২০২৩
[53] সুরবালা হালদার, [৬৪, কাঁচপাড়া, ৭ নম্বর গয়েশপুর কলোনি], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ১২.২.২০২৩

তিনি বর্তমানে সামান্য কিছু রোজগারের জন্য নয় বরং নিজের ছোট ছোট প্রয়োজনের জন্য যাতে সন্তানদের উপর নির্ভশীল হতে না হয়। বয়সের ভার, নানান রোগব্যধি, চোখে ঠিক মতন দেখতে না পাওয়ার সমস্যাকে তিনি কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে মনে করে থেমে থাকেননি। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ উদ্বাস্তু নারীর এমন অদম্য জেদ ও মনোভাব মনকে ভীষণভাবে স্পর্শ করে। হতে পারে তিনি একজন সাধারণ নারী, অসাধারণত্বের পথ তিনি পাড়ান নি, বেশিদূর পড়াশোনা করার সুযোগ হয়ত তার হয়নি কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতায় তার চিন্তাভাবনা হার মানাবে অনেক শিক্ষিত মনস্কের মানুষকেও, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করেছি।

উদ্বাস্তু নারী ভগবতী দাসের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আরেকজন উদ্বাস্তু নারীর স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়ে নারীর উদ্বাস্তু জীবন বিষয়ে ধারণা নির্মিত হয়।[54]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে, তার পিতা-স্ত্রী নিয়ে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালে কলকাতায় জন্ম হয় তাঁর। প্রথম শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছান, সেখান থেকে আত্মীয়ের বাড়ি লেক গার্ডেন্সে কিছু দিন থাকেন, তারপর পুনর্বাসন পাওয়ার জন্য, যোধপুর কলোনিতে গিয়ে কিছুদিন থাকেন। যোধপুর কলোনির ১০টি পরিবার কে নির্বাচন করা হয়, যাদেরকে গয়েশপুরে সরকার থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেই সময়ে তাঁরা যোধপুর কলোনি থেকে, গয়েশপুরে পুনর্বাসন পায়। গয়েশপুর কলোনিতেই তাঁর বেড়ে ওঠা। পিতার ইচ্ছে ছিল প্রথম সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার করবেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি।

'মনীন্দ্র ধর' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মেঝেতে চট পেতে পড়াশোনা শুরু হয়, এরপর আঞ্চলিক স্থানীয় স্কুল নেতাজী বালিকা বিদ্যামন্দিরে পড়াশোনা করে, কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে তৎকালীন খাদ্য আন্দোলনে, একটি মিছিল বেরোলে সেখানে অংশগ্রহণ করায়, তাকে তার স্কুল থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়, তাই ওই স্কুল থেকে তার আর পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি, পড়াশোনাতে তীব্র আগ্রহ থাকায়, তিনি হাল ছাড়েন নি। অঞ্চলিক নগেন্দ্র বালা স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন, কিন্তু তাতে তিনি অকৃতকার্য হন । এছাড়াও তিনি এন সি সি পার্ট টু পরীক্ষাও দেন। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্বেও, তাঁর আর শিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠেনি, মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর বৈবাহিক জীবন শুরু হয়। বৈবাহিক জীবনের নানান চড়াই উৎরাই তাঁর জীবনকে,

[54] ভগবতী দাশ, [৬২ ৭ নম্বর গয়েশপুর কলোনি, কাঁচড়াপাড়া], সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক স্বয়ং, ২৪.৪.২০২৩

তাঁর নিজ ইচ্ছে পূরণের বা শিক্ষা গ্রহণের জগৎ থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়, এক উদ্বাস্তু নারীর স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পায়নি। এক মাত্র কন্যা সন্তান ও স্বামীর সংসারে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

পিতা চাষাবাদের কাজ করলেও, পরে তিনি গয়েশপুর গোল বাজারে, মিষ্টির দোকান দেন। দোকানের নাম নিজের সন্তনের নামে দেন- 'ভগবতী মিষ্টান্ন ভান্ডার'। খুব অল্প দিনেই তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন।

জাতিগত অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এক প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার কথা বলেন। গয়েশপুর কলোনির অধিকাংশরাই ছিলেন ব্রাক্ষণ, কায়স্থ পরিবারের, তবে প্রতিবেশি একটি পরিবার ছিল নমশূদ্র পরিবার। তাদের সাথে স্বাভাবিক ভাব ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও, তারা কোনো খাবার দিলে, তারা সেটা রেখে দিতেন- খেতেন না, পরের দিন তা ফেলে দিতেন। প্রতিবেশী একটি কায়স্থ পরিবারের সন্তান, সেই নমঃশূদ্র বাড়িতে গিয়ে, তাদের সাথে একসাথে খাবার খেয়েছিল বলে, তার মাথা ন্যাড়া করে, স্নান করিয়ে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, দেশবিভাজন কিংবা অভিবাসন কোনো কিছুই কোনোদিনই মানুষের মনের ভিতরে থাকা জাতিগত বিভাজনকে মুছে ফেলতে পারেনি। ৭ নম্বর গয়েশপুর কলোনিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এইভাবে তাঁর বয়ানের মধ্যে দিয়ে, গয়েশপুর উদ্বাস্তু কলোনির প্রসঙ্গ যেমন উঠে আসে, আবার একজন উদ্বাস্তু নারীর জীবনের অপূর্ণ স্বপ্ন, না পাওয়ার কথা উঠে আসে। আবার খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথাও জানা যায়। এর থেকে একজন উদ্বাস্তু নারীর শিক্ষিত, বৈপ্লবিক মনস্ক বা চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গ আলোচনাতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৪.৬. শহরের কলোনির উদ্বাস্তু নারী এবং শহরের থেকে দূরে ক্যাম্পের নারীর মধ্যে পার্থক্য

এই পার্থক্য নিম্নরূপ-

- শহরের কলোনির মেয়েরা ছিল শিক্ষিত। এরা পড়াশোনা করে, চাকরি করে, পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

- ক্যাম্পের নারীদের কোনো থাকার জায়গার নিশ্চয়তা ছিল না, তারা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে পুনর্বাসনের জন্য। তাদের লড়াই ছিল অন্যরকম, সেই আবহে পড়াশোনা করার মতন পরিবেশ বা পরিস্থিতি কোনোটাই তাদের ছিল না।
- শহরের মায়েরা খুব সহজেই শহুরে আদব কায়দা, প্লিট দিয়ে শাড়ি পড়ার ধরণ রপ্ত করে নিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পেয়েছিল শহুরে সমাজে টিকে থাকতে হলে তাদের নিজেদের বদলাতে হবে এবং দ্রুত। অন্যদিকে, ক্যাম্পের মহিলাদের চিন্তা করতে হয়েছিল খাদ্যের জন্য, নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসের জন্য।

আলোচ্য অধ্যায়টিতে উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল। দেশবিভাজন কিংবা অভিবাসন পর্বে যে সমস্ত নারী কেন্দ্রিক আলোচনা পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশতেই নারীকে 'লাঞ্ছিত', 'ধর্ষিত', 'অপমানিত'–এইরকম কতগুলি পরিচিত এবং একপেশে ভাবে দেখা হয়েছে এবং একটা সীমাবদ্ধ আলোচনা দেখা গিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে অভিবাসন পর্ব সমাজে এক নতুন নারী শ্রেণির জন্মও দিয়েছিল। জীবনযুদ্ধে যারা কখনো হার মানেননি বরং নিজেদের এবং তার সাথে সাথে নিজেদের পারিবারিক জীবনকেও নতুনভাবে গড়ে তুলেছিল। এই নারীদের প্রসঙ্গেই আমি সমগ্র অধ্যায়টি নির্মাণের চেষ্টা করেছি। এতে এমন কতগুলি উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছে যা নিয়ে কথা বলা হয়নি এবং যা নারী সমাজের এক অন্যরূপ নির্ধারণ করে।

উপসংহার

গবেষণাপত্রটির শেষে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম 'উদ্বাস্তু অভিবাসন' প্রসঙ্গে কাজ শুরু করি এম ফিল পর্বে। তারপরে সেই বিষয়টিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি পি এইচ ডি- এর সময়েও। এই দীর্ঘ সময়ে যখন আমি কাজ করছি তখন বহু বই প্রকাশিত হয়েছে এই উদ্বাস্তু বিষয়ে। বিষয়টিকে অন্যভাবে ভাবা প্রয়োজন ছিল। সেই মুহূর্তে মনে পড়ে 'উদ্বাস্তু কলোনি'র কথা। উদ্বাস্তু অভিবাসনের মত বিষয় নিয়ে বহুবার চর্চা হয়ে গেলেও উদ্বাস্তু কলোনির ইতিহাস অসমাপ্ত। যদিও 'বিজয়গড় কলোনি' নিয়ে বহু আগেই আমরা জানতে পারি। তাই এই কলোনিকে বাদ দিয়ে আমি শহরতলির এমন কয়েকটি কলোনিকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছি, যে কলোনি নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি।

এই কাজ করতে গিয়ে আমার সাহায্য নিতে হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষার। কলোনির যারা বাসিন্দা তাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কথা বলে আমি কলোনির ইতিহাস ও বর্তমানকে জানার চেষ্টা করেছি। তবে এই কাজে মূল দুটি বিষয়ে আমাকে ভীষণভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বারবার। প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকারের এন আর সি, সি এ এ – এর মতন শব্দগুলিকে সকলের কাছে আনা। কারা নাগরিক, কারা নাগরিক নয় - এমন নানা প্রশ্ন বিশেষ করে 'উদ্বাস্তুদের' মনে ভীতির সঞ্চার করেছে এবং করছে। তারা সাবলীলভাবে সাক্ষাৎকার দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং অপ্রস্তুত হয়েছে বারবার। অনেকেই উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রশ্ন করলে এড়িয়ে গিয়েছে। ফলে সেখানে সমস্যা হয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় এই 'ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক' কাজে বাধা সাধন করেছে, তা হল 'কোভিড' বা 'করোনা'কালের গৃহবন্দী জীবন। এই দীর্ঘ সময়ে সাক্ষাৎকার নেওয়ার কাজে আমায় প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়েছে বারবার।

সমস্যাগুলিকে সঙ্গে নিয়েই আমার কাজ করার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি মূল চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু কলোনি নিয়ে কাজ তাই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বাস্তু অভিবাসন প্রসঙ্গ এসেছে। এক্ষেত্রে কত ধরণের উদ্বাস্তু, তারা কোন সময়ে আসে এবং আসার পর সরকার কিভাবে বিষয়টিকে দেখেছে, কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে এসমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি সরকারি নথি ব্যবহার করেছি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আর্কাইভ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি যা বর্তমানে পুরোনো রায়টার্স বিল্ডিং এর নীচতলে রয়েছে। এগুলি থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে মুখের কথার ভিত্তিতে একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে শহরতলির কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনি বিষয়ে। যে কলোনিতে আমাদের বাস, প্রতিদিন যেখান দিয়ে যাতায়াত করি, যে মানুষদের সঙ্গে আমরা থাকি, একসাথে নানা কাজ করি- তাদের কথা জানতে, শুনতে প্রবল ইচ্ছেবোধ থেকেই এই আলোচনার প্রেক্ষিত নির্মাণের চেষ্টা করেছি। বর্তমানে উদ্বাস্তু কলোনির দীর্ঘদিনের চেনা ছবি অমলিন। কলোনির বুকে জাঁকিয়ে ওঠা 'প্রমোটিং' ব্যবসা, একের পর এক ফ্ল্যাট বাড়ি এমন পরিবর্তনের কারণ। কিন্তু কলোনির পুরোনো জমি, বাড়ি 'উদ্বাস্তু স্মৃতি'র চিহ্ন বহন করে। এই বিষয়গুলির প্রতি আগ্রহ থেকেই কলোনির ইতিহাস জানতে চেয়েছি।

সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি পূর্ববর্তী অধিবাসীদের সাথে উদ্বাস্তুদের সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্পর্ককে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু সমাজের 'দ্বন্দ্ব' প্রকাশ পায়।

সর্বশেষ অধ্যায়টি 'উদ্বাস্তু নারী' বিষয়ে। 'উদ্বাস্তু নারী'কে একটু অন্যরকমভাবে ভাবার চেষ্টা করেছি। যে উদ্বাস্তু নারী সমাজ অভিবাসনে, বিপদের দিনেও নিজেদের হারিয়ে ফেলেনি। বরং প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে গিয়েছে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে আমি সাহিত্য ও স্মৃতিকে যেমন ব্যবহার করেছি, আবার সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে এক অন্য উদ্বাস্তু নারী জীবনকে বুঝতে চেয়েছি।

উল্লেখ্য, কলোনির ইতিহাস নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে ক্রমশই কলোনিগুলি নিজেদের চিহ্ন হারিয়ে ফেলতে বসেছে। আমরা যদি এই বিষয়ে কথা না বলি বা না ভাবি- তাহলে একটা প্রজন্ম জানতেই পারবে না তাদের অতীত সম্পর্কে। চূড়ান্ত বিপদের দিনেও কিভাবে একের পর এক কলোনি গড়ে উঠেছে- এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।

আমি নিজে একজন উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে এবং স্ত্রী। তাই আলোচনার একেবারে শেষে আমি নিজের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। আমি মনে করি, ইতিহাসের পাতায়, সাহিত্যে কিংবা সরকারি নথিপত্রের বাইরেও একটা নিজেস্ব উপলব্ধির জায়গা থাকে।

কলকাতা শহতলির সন্তোষপুর বিধান কলোনির এক বৃহৎ উদ্বাস্তু পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পেশায় দাদু ছিলেন একজন মৎস্য বিক্রেতা। স্ত্রী, দুই পুত্র এবং চার কন্যা

সন্তানদের নিয়ে পরিবার। ১৯৫০ সালে বাংলাদেশের ঢাকা শহর থেকে অভিবাসিত হয়ে কলকাতায় আসেন। অঞ্চলের লোকেদের সাহায্যে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে জমি পান। অত্যন্ত সৎ এবং সাহায্যকারী পরিশ্রমী দাদু অল্পদিনেই মাছ ব্যবসায়ে হোলসেলারে পরিণত হন। একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দাদুর মুখে বারবার শুনেছি তাঁর উদ্বাস্তু জীবনের নানান কথা। উল্লেখ্য, নিজের ছেলেদের কিন্তু তিনি এই ব্যবসার কাজে নামাননি। তাদের পড়াশোনা শিখিয়েছেন, তারা সরকারি চাকরি করেছে। তিনি নিজেই চাননি তাঁর পরিবারের কেউ এই কাজ করুক। এই কাজে টাকা থাকলেও, সম্মান ছিল না।

নিজের প্রসঙ্গে বলি, উদ্বাস্তু পরিবারে ছোট থেকেই এটা শেখানো হয়েছিল সকলকে ভালোবাসতে বা প্রয়োজনে সকলের পাশে দাঁড়াতে। সমস্ত কিছুতেই আমার মায়ের একটা অবদান আছে। তাঁর ইচ্ছেতেই আমি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পেরেছি। ২০১৫ তে শুরু হয় বিবাহিত জীবন। এক উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে – এক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আরেক উদ্বাস্তু পরিবারে পৌঁছাল। এখান থেকে শুরু হল নতুন ভাবনা, নতুন উপলব্ধী। কিন্তু সমস্যা হল ‘নতুন শিক্ষা’য়। দুটি পরিবারই উদ্বাস্তু পরিবার কিন্তু শিক্ষা, বৈচিত্র্যে সবেতেই আলাদা। যা আমায় উপলব্ধী করায় যে পূর্ববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের বসতি নির্মাণ করেছিল, তাদের নিজেদের মধ্যেও কিন্তু একটা বিশাল পার্থক্য ছিল সবসময়ে। এই পার্থক্য শিক্ষায়, সহবতে, সামাজিকবোধে, সংস্কৃতিতে। আমি যে উদ্বাস্তু পরিবার দেখে এসেছি বা জেনে এসেছি, যেমন পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা বা গড়ে ওঠা সেখানে মেয়েদের গুরুত্ব ছেলেদের থেকে কিছু কম নয়। আর যে উদ্বাস্তু পাড়ায়, পরিবারে এলাম সেখানে পুরুষবাক্যের জোর মূল কথা। সমস্যা শুরু হল এখান থেকেই। পার্থক্যগুলো বেশ সূক্ষ্ম হলেও আমার কাছে এর গুরুত্ব ভীষণ। উদাহরণ স্বরূপ বলি- আমাদের ছোট থেকে মা যেকোনো প্রসঙ্গে বলতে শিখিয়েছিলেন- ‘আমাদের’ যেমন ‘আমাদের বাড়ি’, ‘আমাদের কাজ’, সবেতেই আমরা। কিন্তু আরেক উদ্বাস্তু পরিবারে প্রতিক্ষেত্রে ‘আমার’ পরিবর্তে ‘আমি’ শব্দের গুরুত্ব। আরেকটি বিষয় আমায় ভাবিয়েছে, পারিবারিক বিবাদে পাড়ার লোকেদের অবাধ বিচরণ। এই পাড়া কিন্তু ‘উদ্বাস্তু’ পাড়া। একজনের বিপদেও যেমন উদ্বাস্তু পাড়া এক হয়ে যায়, আবার পারিবারিক যে বিষয়ে কথা বলা উচিৎ নয়, তাতেও ‘উদ্বাস্তু’ পাড়া এক হয়ে যায়। পারিবারিক বিবাদে, আমার মা এবং আমার উদ্দেশ্যে বলা কিছু উক্তি তুলে ধরা হল। যেমন ‘বাপের বাড়ির লোক আসবে, চা বিস্কুট খাবে আর গেট আউট হয়ে যাবে।’ এমন সংস্কৃতি আমায় সেদিন অবাক করেছিল। এমন উদ্বাস্তু সংস্কৃতির সাথে আমি

পরিচিত ছিলাম না। নতুন পরিবারে একজন বলেন ‘পাড়ার লোক আমার হাতে আছে- ব্যাস আর কোনো চিন্তা নেই’ আরেকজন বলেন, ‘এটা কলোনি বেল্ট, এখানে এরকম হয়’। তিনটি কথা আমি আমার জীবনে প্রথম শুনলাম। (১) ‘বাপের বাড়ির লোক শ্বশুর বাড়ি এলে, চা বিস্কুট খাবে আর গেট আউট’, (২) ‘পাড়ার লোক আমার হাতে আছে আর কোনো চিন্তা নেই’, (৩) ‘এটা কলোনি বেল্ট, এখানে এরকম হয়’- ‘উদ্বাস্তু সংস্কৃতি’র একটা নতুন দিক সেদিন প্রত্যক্ষ করি। এতে বোঝা যায়- ‘জোট বাঁধা’র তাদের মধ্যে এখনও বর্তমান। যাইহোক এমন নানান বিষয়গুলি থাকলেও, উদ্বাস্তু পাড়ার ‘জোটবদ্ধতা’ আমার ভালোলেগেছিল। এই ‘জোটবদ্ধতা’ তাদের জীবনের শক্তি। এখনকার শহুরে ফ্ল্যাট কালচারের মতন ‘যার যার – তার তার’ বিষয়টা এখানে নেই। এমন উদ্বাস্তু বন্ধুদেরও আমি সবসময় পাশে পেয়েছি যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন নানা সমস্যায়।

সংযোজনী

সংযোজনী - ১: সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণে, কলোনির বিষয় জানতে আমি যে প্রশ্নপত্র তৈরি করেছি তার একটি স্বরূপ প্রদান করা হল-

- উদ্বাস্তু কলোনির নাম:
- উদ্বাস্তু যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তাঁর নাম: বয়স:
- পারিবারিক পরিচিতি: পেশা:
- শিক্ষাগত যোগ্যতা:
- তিনি কোন সময়ে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন?
- কি কারণে দেশত্যাগ করেন?
- কোন পথে আসেন?
- পুনর্বাসন পেয়ে থাকলে কোথায় এবং কিভাবে পেয়েছেন?
- জবরদখল কলোনির ক্ষেত্রে কিভাবে জায়গা পেলেন?
- কেন ঐ জবরদখল কলোনিকেই নির্বাচন করেছিলেন?
- কলোনি নির্মাণে আঞ্চলিক বাধা কি এসেছিল?
- পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী অধিবাসীদের কেমন ব্যবহার ছিল?
- সরকারি কর্মী বা রাজনৈতিক দলগুলির কী প্রতিক্রিয়া ছিল?
- এক জীবনে কতবার স্থান পরিবর্তন করেছেন এবং কেন?
- কলোনি কমিটি কী কাজ করেছে?
- কলোনি নির্মাণে রাজনৈতিক দলের কী প্রভাব ছিল?
- জাতিভিত্তিক কোনো অভিজ্ঞতা বা সমস্যা যেটা আপনি ভাগ করতে চান
- আপনি কি নিজের ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে চেয়েছেন? হ্যাঁ বা না- যেকোনো বিষয়ে অভিমত
- কলোনি কালচার কেমন?
- বর্তমানে কলোনি জুড়ে যে ‘প্রমোটিং’ দৌরাত্ম্য রয়েছে, সে বিষয়ে আপনার মতামত কী?
- কলোনি কালচার ও ফ্ল্যাট কালচার কে কিভাবে দেখছেন?
- কোনটাকে সমর্থন করবেন এবং কেন?

সংযোজনী - ২: উদ্বাস্তু কলোনির চিত্রসমূহ

চিত্র - ২.১: রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প হাসপাতাল আবাসনের চিত্র

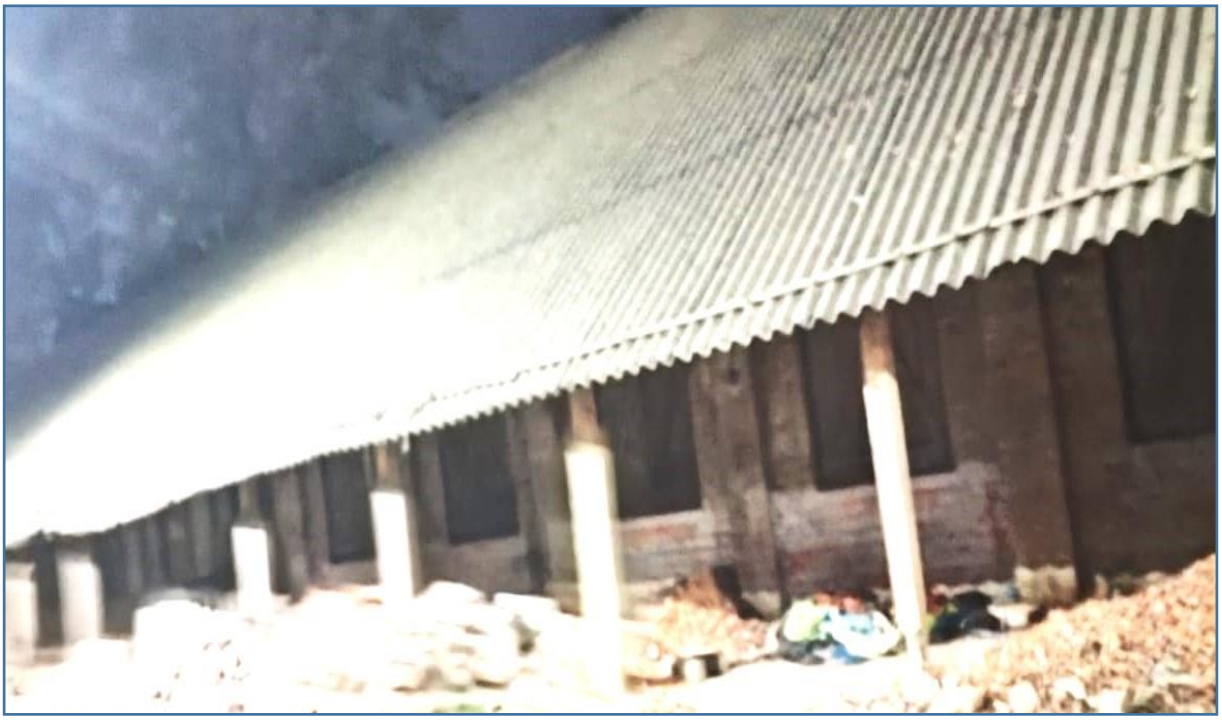

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, তাং – ২২.০৮.২০২৩।

চিত্র - ২.২: পল্লীশ্রী আবাসনের মানচিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান –টলিগঞ্জ, তাং – ১৮/০৫/২০২২।

চিত্র - ২.৩: বিবেকনগর কলোনি আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন স্কুলের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান –বিবেকনগর, তাং – ১৫/০৮/২০২২।

চিত্র - ২.৪: সংহতি কলোনি বাজারের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – বাঘাযতীন, তাং – ২৬/০৮/২০২৩।

চিত্র - ২.৫: কাটজুনগর জাগৃতি সংঘ ক্লাবের চিত্র

চিত্র - ২.৬: রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প ড. বি. আর. আম্বেদকরের মূর্তি

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – কাটজুনগর ও রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, তাং – ১৫/০২/২০২০ ও ২২.০৮.২০২৩।

চিত্র - ২.৭: পোদ্দারনগর কলোনি কমিটির কার্যালয়ের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – পোদ্দারনগর, তাং – ২০/০২/২০২৩।

চিত্র - ২.৮: রায়পুর সং হতি কলোনি ক্লাবের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, তাং – ২৩/০৯/২০২২।

চিত্র - ২.৯: রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প হাসপাতাল আবাসনের চিত্র

চিত্র - ২.১০: রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পের বাসিন্দার জাতি শংসাপত্র

APPENDIX 15

Form of Certificate to be produced by a Candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Support of his claim (Para 24(ii))

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Sree Shashadhar Das. son/daughter of Sree Priya Lal Das of village Coopers' Camp P.S. Ranaghat Dist. Nadia in the West Bengal State belongs to the 'Namasudra' community which is recognised as a Scheduled Caste/Tribe under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956, read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman & Nicobar) Scheduled Tribes Order, 1959.

Shri/Sm. Shashadhar Das. and/or his/her family ordinarily reside(s) in the Village - Coopers' Camp Block/194 P.O. Ranaghat. District of the Nadia in the State of West Bengal.

Place-Ranaghat

Date: 9.1.75

Signature 9/1/75

Designation with Subdivisional Officer Ranaghat

Seal of Office

State/Union Territory.

The term 'Ordinarily reside' used here the same meaning as in Section 20 of the Representation of Peoples Act, 1950.

Sunil/9.12.74

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, তাং – ২২.০৮.২০২৩।

চিত্র - ২.১১: গয়েশপুর ৭ নং কলোনির নাগরিকের চিত্র

চিত্র - ২.১২: পি. এল ক্যাম্প বেদীভবন কলোনির নাগরিকের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – নদীয়া, তাং – ২২.০৭.২০২৩।

চিত্র - ২.১৩: সংহতি কলোনি স্কুলের চিত্র

চিত্র - ২.১৪: পোদ্দারনগর ক্লাবের চিত্র

সূত্র: গবেষক সঙ্ঘমিত্রা দাস দ্বারা গৃহীত। স্থান – বাঘাযতীন ও পোদ্দারনগর, তাং – ০২/০৮/২০২৩ ও ২৪/০৪/২০২৩।

গ্রন্থপঞ্জি

(ক) মৌলিক উপাদান

সরকারি নথি

ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত নথি:

Census of India 1951 Vol.VI part III, Calcutta City. (G.P / 312 54 In 2)

CMDA, Introduction to the programme for basic settlement, employment infrastructure & basic community facilities Calcutta 1976 (GP/711 409/5415c126-i)

CMDA, Towards a better Calcutta, January 1972. (GP/711 409/ 5415c126da)

Committee of Review of Rehabilitation work in West Bengal, Department of Rehabilitation (GP/361 5/ 5415)

District Statistical Handbook, Kolkata, (GP/315/415/W52kol)

Educational Facilities for Displaced Persons from East Pakistan, Some Aspects of Rehabilitation

Five Year Plan, Dr B C Roy reports to the Nation the 1''5-year plan, 1951-55 (GP/338 95415/R8112)

Reception, Dispersal and Rehabilitation of New Migrants Arriving in India from East Pakistan since !st January, 1964. (G.P/ 336.54)

Rehabilitation of Camp Refugees; Statement issued by Dr.B.C Roy, Chief Minister, West Bengal, October 13, 1958

Rehabilitation of Refugees – A Statistical Survey, 1955. (G.P/ 361.5 1 5415)

Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal – Statement issued by the Government of West Bengal, December 11, 1957. (G.P/ 361. 5 1 5415)

Relief of Distress person in West Bengal: Food, Relief and Supplies Department. Government of West Bengal. (G.P/ 361.5 1 5415)

Report on Conferment of Right and Title to land on Displaced Persons from erstwhile East Pakistan in West Bengal and remission of Type loans. (G.P / 361.5 5415 In 2 re)

Report on Development of Colonies of Displaced Persons from erstwhile East Pakistan in West Bengal. Committee of Review Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Supply and Rehabilitation, June, 1974. (G.P/361.5/5415 No. 20)

Report on Displaced Persons Migrating from East Pakistan to West Bengal. (G.P/ 309/15415)
State Statistical Bureau, Trends in Industries of West Bengal, 1950-57. (G.P/338/5415/W52)
The Admistrative of Evacue Property Act, 1950 (G.P/ 361.5 5415) In r
The Displaced persons compensation and Rehabilitation Act, 1954. (G.P/361.5 1 54 gn-2. Crd.)
Training & Employment Opportunities for Displaced Persons from East Pakistan, some aspects of Rehabilitation in West Bengal. Ministry of I & B., 1960. (G.P/ 361.6 5415)
West Bengal Census, District Census Handbook 1971 (GP/312/ 5415/W52)
West Bengal Hiranmoy Banerjee (GP/ 338/ 5415)
Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal, 1976 (GP/361 5/ 5415) in West Bengal Ministry I & B. 1960 (GP/361.6/5415)

সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, কলকতা থেকে প্রাপ্ত নথি:

A Handbook of Government Policy & Plan for the Resettlement of Refugees Population June 1948, July 1948(2) VIII o13
Manual of Refugee and Rehabilitation Vol.1 1998, VIII 16-1
R.R Committee's Report, VIII 13-4
Refugee Rehabilitation Committee Report, Government of West Bengal, Chairman Samar Mukherjee 1981/VIII 13-4
Rehabilitation of Refugees a Statistical Survey 1955/VIII 13-2
Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal 1956, VIII 13-3
Report on Sample Survey of population in West Bengal, 1962 Government of West Bengal State Statistical Bureau 1967
Report on the Sample Survey for Estimating the Socio-Economic characteristics of Displaced persons migrating from Eastern Pakistan to the State of West Bengal, State Statistical Bureau, Government of West Bengal 1951, VIII 13-1

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি:

Government of India, Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal, Ministry of Supply and rehabilitation. March 1976
Handbook of Refugee Rehabilitation, Government of West Bengal
Infrastructure Development in Refugee Colonies

Manual of Refugee and Relief and Rehabilitation, Vol-1, Government of West Bengal, 2000

Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, 1957

স্টেট আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত নথি:

Government of West Bengal- Home Political Department, Directorate or Branch-Politacal, 1950, Registered File No. CR-167/50, WBSA

Inadequate Supply of rations to refugees and mal administration in East Bengal Refugees Camps, File No. CR 297/50, WBSA

Ministry of External Affairs, Branch Secretariat, 6, Esplanade East, Calcutta- 2 nd March, 1951, File No. 4M-14/51, WBSA

Question of Employment of East Bengal Refugees in the Vacancies in the Govt. of India, Deptts in Calcutta and West Bengal, File No. 9.D.M.872/48, WBSA

Refugee meetings, in 1955 in IB, S.No, 46/22, File No. 321/22, PartV, WBSA

Report of Fourth Annual Conference of The UCRC, held at Cooper's Camp, Ranaghat on 7, 8 and 9 th December 1957, S. No. 313/39, File No. 303/39, WBSA

Report regarding the prevention and harassment of passangers from or coming to West Bengal from East Bengal, File No. CR 155/50, WBSA

সংবাদপত্র

'উদ্বাস্তু ছাত্রদের শিক্ষা', আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৫৫।

'উদ্বাস্তু পুনর্বসতি ব্যবস্থাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ কার্তিক, সোমবার, ১৩৫৬।

'উদ্বাস্তুদের বসবাস সমস্যাঃ শহর অঞ্চলে উচ্ছেদ রোধ করার অনুরোধ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ শে আশ্বিন, ১৩৫৫।

'জনসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিলে খাদ্য ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মে, ১৯৪৯।

'ঠাঁই হারার যন্ত্রণা ধরে রেখেছে সাহিত্য', দেবযানী দাশগুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ২৭ শে আগস্ট, ২০১৭।

‘পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা’, আনন্দবাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার, ১ লা অগ্রাহায়ন, ১৩৫৬।

‘বিধবা বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য ও অন্যান্য উদ্বাস্তুকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাঃ ভারত সরকারের পরিকল্পনা’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৯।

‘ভারত গর্ভনমেন্ট কর্তৃক উদ্বাস্তু অর্ডিন্যান্স জারীঃ ‘উদ্বাস্তু’ সংজ্ঞা নির্ধারণ ও উদ্বাস্তু সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা কার্তিক, ১৩৫৫।

পারামট প্রয়োজন’, আনন্দবাজার পত্রিকা বৃহিস্পতিবার, অক্টোবার ২৭, ১৯৪৯।

সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত- সংবাদ দাতার পত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা,বুধবার-১২ই অক্টোবর, ১৯৪৯।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার:

সন্তোষপুর বিধান কলোনি

রাধেশ্যাম দাস, ২ রা জুন,২০১৭

কনক সরকার, ২ রা জুন, ২০১৭

মুক্তিপদ সরকার, ২ রা জুন, ২০১৭

নিত্যানন্দ দাশ, ২ রা জুন, ২০১৭

সোমা রায়, ২৩ শে মার্চ, ২০১৮

বাবুন ভট্টাচার্য, ২৩ মার্চ, ২০১৮

ননীবালা দাস, ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সোমা দাশ, ৫ ই জানুয়ারি, ২০২৩

বাবুল নস্কর, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩

রত্না সাহা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

সংহতি কলোনি

শশাঙ্ক মজুমদার, ৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

চঞ্চল মজুমদার, ১ লা মে, ২০১৯

বিমল হালদার, ৫ জুলাই, ২০১৯

অমল ব্যাপারী, ১০ ই জানুয়ারি, ২০২২

অনির্বান নাথ, ১০ ই জানুয়ারি, ২০২২

পিনাকি মজুমদার, ১ লা ফেব্রুরারি, ২০২২

সোনালি সাহা, ১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

শৈলেন ঘোষ, ১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বিবেকনগর কলোনি

মলয়কান্তি দাশ, ২ রা জানুয়ারি, ২০১৯

আত্রেয়ী সেনগুপ্ত, ২ রা জানুয়ারি ২০১৯

সোনালী মুখার্জী, ২ রা জানিয়ারি, ২০২২

শুভঙ্কর দত্তগুপ্ত, ২রা জানুয়ারি, ২০২২

নীলমণি নস্কর, ৫ জানুয়ারি, ২০২২

কাকলি সরকার, ৫ জানুয়ারি, ২০২২

পোদ্দারনগর কলোনি

জগন্নাথ সাহা, ৩ রা জুন ২০১৯

পাপিয়া সাহা, ৪ ঠা জুন ২০১৯

রতন হালদার, ৪ ঠা মে, ২০২১

কাটজুনগর

কাজল রায়, ২রা এপ্রিল, ২০২২

মিতালি ঘোষ, ২রা এপ্রিল, ২০২২

রঞ্জন বিশ্বাস, ১০ ই জানুয়ারি, ২০২৩

শ্বেতা মজুমদার, কাটজুনগর কলোনি, ১০ ই জানুয়ারি, ২০২৩

কিংশুক হালদার, কাটজুনগর কলোনি, ১০ ই জানুয়ারি, ২০২৩

অরুনাভ চক্রবর্তী, কাটজুনগর কলোনি, ১৭ ই জানুয়ারি, ২০২৩

লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি, কামালগাজি

পারমিতা সাহা, ৩ রা আগস্ট, ২০১৯

দীপক সরকার, ৩ রা আগস্ট, ২০১৯

নির্মল দাশ, ৩ রা আগস্ট, ২০১৯

পরেশ বণিক, ৩ রা আগস্ট, ২০১৯

মাণিক নাথ, ৩ রা আগস্ট, ২০১৯

অরূণা রায়,৪ ঠা আগস্ট, ২০১৯

মঞ্জু সাহা, ২৩ আগস্ট, ২০১৯

মণিকান্ত হালদার, ৪ ঠা সেপ্টেম্বর,২০২২

চন্দ্রানী সাহা, ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২২

আজাদ্গাড় কলোনি

রবীন শীল, ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ঝিলিক সমাদ্দার, ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

জীবন সাহা, ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

কার্তিক সরকার, ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

মহুয়া ভট্টাচার্জ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

গোপাল নস্কর, ৪ ঠা ডিসেম্বর, ২০১৯

গয়েশপুর কলোনি

চিত্তরঞ্জন দাস বর্মন, ২ রা জানুয়ারি, ২০২৩

সুধারানি হালদার, ১১ ই জানুয়ারি, ২০২৩

জয়ন্তী সাহা, ১১ ই জানুয়ারি, ২০২৩

স্বপন সাহা, ১৫ ই জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পা শীল, ১৫ ই জানুয়ারি, ২০২৩

রনজিৎ সাহা, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৩

গীতা সাহা, ২ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

সিন্ধু সাহা, ২ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

পি এল ক্যাম্প, নদীয়া

প্রণতি দাস, ২ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

গীতা দাশ, ২ রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

রীনা সাহা, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২৩

সান্তা সরকার, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২৩

কনকচাঁপা নস্কর, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২৩

নমিতা প্রামানিক, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২৩

মান্তু নস্কর, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২৩

কুপার্স ক্যাম্প, রাণাঘাট

বিনয় মজুমদার, ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০

স্বপন দাস, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২২

অশোক দাস, ৩০ শে নভেম্বর, ২০২২

শীলা সাহা, ৩০ শে নভেম্বর, ২০২২

মিথিলা দাস, ৪ ঠা ডিসেম্বর, ২০২২

অভিজিৎ সাহা, ৪ ঠা ডিসেম্বর, ২০২২

অমল দাশ, ২রা নভেম্বর, ২০২৩

মিলি হালদার, ২রা নভেম্বর, ২০২৩

লক্ষীকান্ত সাহা, ২ রা নভেম্বর, ২০২৩

আত্মজীবনীমূলক উপাদান:

ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি (প্রথম খন্ড)- উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), নিজস্ব প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৭।

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিকড়ের সন্ধানে, কলকাতা, ২০০২।

দেবব্রত দত্ত, বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০০১।

মণিকুন্তলা সেন, জনজাগরণে, নারী জাগরণে, জন্ম শতবার্ষিকী রচনা সংগ্রহ, মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, থীমা, কলকাতা।

মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র, কলকাতা, ১৯৮২।

হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০।

সাংগঠনিক তথ্য:

ইউসি আর সি-র দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদন, ১৯৭৭

সংগঠনের অভিমুখ, পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতি, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর

স্মরণিকা, ইউ সি আর সি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির , ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন, ২০০০

সংগঠনের অভিমুখ, পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতি, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৮

কলোনির প্রকাশিত নিজস্ব স্মারকঃ

অনুরণন, শশাঙ্ক মুখার্জী সম্পাদিত, সংহতি কলোনি, ২০১১

বিবেকনগ কলোনি সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ, স্মারক সংখ্যা, বিবেকনগর, যাদবপুর, ২০০০

শহীদনগর কলোনি সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ, স্মারক সংখ্যা, শহীদনগর, ঢাকুরিয়া, ২০০০

(খ) গৌণ উপাদান

ইংরেজী তথ্য:

Bagchi, Amiya Kumar. "*Studies on the Economy of West Bengal Since Independence*". EPW, Vol.33,No. 47, (Nov.21-Dec. 4, 1998)

Bandyopadhyay, Hiranmay. *Udbastu*. Kolkata: Sahitya Samsad, 1970

Basu Ray Chaudhury Anasuya. "*Nostalgia of Desh, Memories of Partition"*, EPW, Vol. 39, No. 52 (Dec.25-31, 2004),pp.5653-5660

Batabyal, Rakesh. *Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali ,1943-1947*. New Delhi: Sage Publications, 2005

Bornat, Joanna. "*Oral History and Qualitative Research"*. Timescapes Methods Guides Series 2012 Guide No. 12, ISSN 2049-9248

Bornat, Joanna. *Oral History, Health and Welfare.* London: Routledge Publication, 2005

Bose, Pradip Kumar (ed.). *Refugees in West Bengal: Institutional Processes and Contested Identities,* Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2000

Chakraborti, Prafulla K. *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal.* Kalyani: Lumiere Books, 1990

Chakravartty, Gargi. *Coming out of Partition: Refugee women of Bengal*. New Delhi: Bluejay Books, 2005

Chatterji, Joya.*The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67*.Cambridge University Press, 2007

Chaudhuri, Pranati. "*Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distributionof Refugees Settlements within the CMD*."Occasional paper, No.55, CSS, 1983

Choudhury, Archit Basu Guha. "*Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women*".

Das, Dhirendra Nath. *Regional Movement: Ethnicity and Politics*. Delhi: Abhijeet Publications, 2005

Das, Tista. *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*. New York: Routledge Publication, 2023

Field, Sean. *Oral History Methodology*. Amsterdam: SEPHIS, 2007

Finnegan, R. *Oral Tradition and the Verbal Arts: A Guide to Research Practice.* London: Routledge, 1992

Ghosal, Anindita (edited). *Revisiting Partition: Contestation, Narratives and Memory*. Primus Books, 2022

Hasan, Mushirul (edited). *Inventing Boundaries: Gender, Politics and the Partition of India.* New Delhi: OUP, 2000

Hasan, Mushirul. *Partition narratives, Social Scientist*. Vol. 30, July- August 2002

Kamra, A.J. *The Prolonged Partition and its Pogroms: Testimonies on Violence against Hindus in East Bengal 1946-64.* New Delhi: Voice of India, 2000

Khan, Yasmin. *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*. New Haven and London: Yale University Press, 2007

Lathura, PN. *Problem of Refugees from East Bengal*, EPW, Vol. 6, No. 50. (Dec.11,1971)

Menon, Ritu and Bhasin, Kamla. *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*. New Delhi: Kali for Women, 1998

Mishra, Omprakash(edited). *Forced Migration in the South Asian Regions: Displacement, Human Rights and Conflict Resolution*. New Delhi: Mainak Publications Pvt. Ltd, 2004

Mishra,O,P and Majumdar A.J (eds.). *The Elsewhere people: Cross- border migration, refugee protection and state response*.New Delhi: Lancer's Books, 2003

Mitra, Ashok. *Parting of ways: Partition and After in Bengal*. EPW, Vol.25, No.44, (Nov. 3, 1990)

Munsi, Vidya. *National Federation of Indian Women: A Brief History*.Delhi: NFIW Publication, 2008

Nilanjana Chatterjee. *Midnight's Unwanted Children: East Bengali Refugees and Politics of Rehabilitation*. Brown University, 1994

Palit, Chattabrata and Roy, Ujjal. *Bengal before and after the Partition (1947): The Changing Profile of a province.* Kolkata: Corpus Resesrch Institute,2004

Pandey, Gyanendra. *Remembering Partition, Violence,Nationalism and History in India*. Cambridge University Press, 2001

Ray,Manas. *Growing up Refugee: On memory and Locality, in Pradip Kumar Bose(ed.): Refugees in WestBengal: Institutional Process and Centested Identities*. Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2000

Ritchie, D. *Doing Oral History,* New York: Twayne, 1995

Roy, Haimanti. *Partitioned Lives Migrants, Refugees, Citizens in India and Pakistan, 1947-1965*. New Delhi: OUP, 2012

Samaddar, Ranabir. *A Biography of the Indian Nation, 1947-1997*. New Delhi: Sage Publications, 2001

Sen Uditi. *Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition.* Cambridge University Press, 2018

Sen, Sarbani. *The legal regime for refugee relief and rehabilitation in West Bengal 1946-58*,in Pradip Kumar Bose(ed.): *Refugees I West Bengal: Institutional processes and contested identities*, Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group

Sengupta Nabanita and Choudhury Suranjana (edited). *Understanding Women's Experiences of Displacement: Literature, Culture and Society in South Asia*. Routledge, 2022

Sengupta, Debjani. *The Partition of Bengal Fragile Borders and New Identities*. Delhi: Cambridge University Press, 2016

Singh, Anita Inder. *The Partition of India.* New Delhi: National Book Trust India, 2006

Talbot, Ian and Singh, Gurhapal. *The Partition of India*. New Delhi: Cambridge University Press, 2009

Thompson, A and Perks, R. *The Oral History Reader*. London: Routledge, 1998

Thompson, P. *The Voice of the Past (3rd ed.).* Oxford: Oxford University Press, 1978

বাংলা উপাদান

এবং প্রান্তিক , 'সম্পর্ক', সম্পয়াদনা আশিস রায়, অনন্যা, ৮ম বর্ষ ও ১৭ তম সংখ্যা, ৩২ মে, ২০২১, ISSN: 2582-3841 (o) 2348-487X (P)

ঘোষ, দেবযানী ও সায়ক মাখার্জি। দেশভাগ- অকথিত ইতিহাস। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২৩।

চক্রবর্তী, সুজন। সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম: বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত কলকাতা। কলকাতাঃ ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০২২

চট্টোপাধ্যায় , সাধন সম্পাদিত। দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য। কলকাতাঃ গাংচিল, ২০১৬

তাপস ভট্টাচার্য, উদ্বাস্তু জীবন ও বাংলা উপন্যাস, অনুষ্টুপ, এয়োদশ বর্ষ, প্রাক শারদীয়া, কলকাতা, ১৪০৫

ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মন্ডল, পৌলমী ঘোষাল। ধ্বংস ও নির্মাণ: বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণাঃ সেরিবান, ২০০৭

দাস সুর, সুমনা। দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০

দ্বান্দিকতা: সাহিত্য- সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে, অন্তর্মুখ বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব ১০, সংখ্যা- ১, ISSN 2249-3751

পাল, সুলান্ত। মিলনে বিচ্ছেদে হিন্দু-মুসলমান। কলকাতা: মিত্রম, ২০০৭

বন্দোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার। ভারতভাগ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১০

বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ। স্মৃতি আর সত্তা। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯

বর্মন, রূপ কুমার। পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা। কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২২

বসু, ঝর্ণা সম্পাদনা। ভাগফল: মেয়েদের কথা। কলকাতা: রিকাল বুকস, ২০১৮

বালা, যতীন। দলিত- রচনা দলিত- লেখক (দ্বিতীয় খন্ড)। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২২

বালা, যতীন। শিকড়ছেঁড়া জীবন: উদ্বাস্তু- দলিতের দলিল। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮

বিতর্কিকা, গ্রন্থ সমালোচনার পত্রিকা, প্রসঙ্গ দেশভাগ, অক্টোবর ২০২৩, সেতু প্রকাশনী, ISSN: 2321-855X

ভট্টাচার্য, তপোধীর। আক্রান্ত বাঙালি- দুঃসময়ের নথি। কলকাতা: সোপান, ২০২০

ভাদুরী তন্দ্রিতা ও চন্দ্র রৌম্য। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নারী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়। কলকাতা: রচয়িতা, ২০২৩

মন্ডল, জগদীশ চন্দ্র ।মরিচঝাঁপি- উদ্বাস্তু: কারা এবং কেন। কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫

রহমান, মীজানুর। কলকাতার মহাদাঙ্গার চাক্ষুষ বিবরণ: কৃষ্ণ ষোলই। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০

রায়চৌধুরী, গৌতম।দেশভাগ: কাটজুনগর, দুই পোদ্দারনগর, বিক্রমগড়। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২৪

শৈলেশ কুমার মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিকথা, এই সময় ৫৭তম শীত সংখ্যা, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৮৩৮

সমাদ্দার, বিমান। শহরতলির উদ্বাস্তু- কলোনি: আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান, (১৯৪৭-১৯৭৭)। কলকাতাঃ অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩

সরকার, যতীন। পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫

সাহা, পঞ্চানন। নানা রঙের দিনগুলি। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১৭

সাহা, সুশীল। দেশভাগের সিনেমা। কলকাতা: সোপান, ২০২০

সিংহ, অনিল। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু উপনিবেশ। কলকাতা: বুক ক্লাব, ১৯৯৫

সিঙ্ঘ, কংকর। ১৯৪৭'র বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২

সেন, মণিকুন্তলা। সেদিনের কথা। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২

সেন, মুকুল। সত্তায় স্মৃতিতে দেশত্যাগ: সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস। কলকাতা: অবভাস, ২০১১

সেন, সুজিত সম্পাদিত। বিষয় সাম্প্রদায়িকতা: ফিরে দেখা। কলকাতা: মিত্রম, ২০০৮

সেন,রূপা। শূন্যের মাঝে কলস: দেশভাগ ও কলোনিজীবন। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১

হীরা, আশীস। দেশভাগে নিম্নবর্ণ। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০